সাহানা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

দীপজ্যোতি প্রকাশনী : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকা
শ্রাবণ, ১৩৬
প্রকাশক
বীরেশ্বর সরকার
দীপজ্যোতি প্রকাশনী
১৩১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশনায় সহায়তা করেছেন
ভাস্কর ঘোষ
প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রণবকুমার বিশ্বাস
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ষ্টুডিও ক্যালকাটা
১০১, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা ১৪
মুদ্রক
জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বাঁধিয়েছেন
আলম-কোং
১৬, পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা-৯
দাম: একটাকা বারো আনা

এপিঠিকে ছাপা, ঝরঝরে মুদ্রণ, চাররঙা প্রচ্ছদ, তদুপরি পাতায় পাতায় দু'রঙা নামপত্র, বইটির অঙ্গসজ্জায় কোন ত্রুটিই রাখেননি প্রকাশক। উপন্যাসও নয়, নিতান্তই একটি গল্পসংগ্রহ, লেখকও যেখানে আর কেউ নয়, নিতান্তই আমি। বাণিজ্যিক ব্যর্থতার সবকটা পথ মুক্ত দেখেই যেন তিনি এ'পথে এসেছেন। আমার সাহিত্যসাধনার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অকৃত্রিম ভালবাসা। এ'ক্ষুদ্র জীবনে যাঁদের প্রেরণা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি প্রকাশকবন্ধু তাঁদের অন্যতম। আমি তাঁর দীর্ঘজীবন ও দীপজ্যোতি প্রকাশনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, গ্রন্থকার আমি হলেও, এ নামকরণের সঙ্কলয়িতা আমি নই—প্রকাশক।

ছাপাখানার ভূত তাড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বন্ধুবর মহাদেব ভট্টাচার্য্য। ভালো ওঝা যে তিনি নন, আমার বইটিই তার বড় প্রমাণ। তবু তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি নিজে যদি সে দায়িত্ব নিতাম তবে হয়তো 'সেকেণ্ড প্রুফের' ওপরই বইটি ছাপা হত।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

সূচী—

প্রথম প্রকাশকাল

মাকে বাবাকে
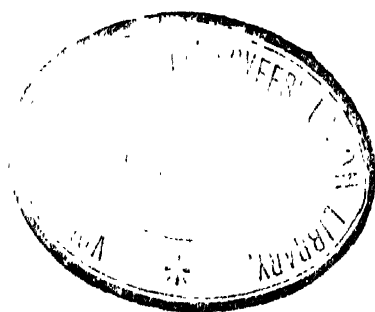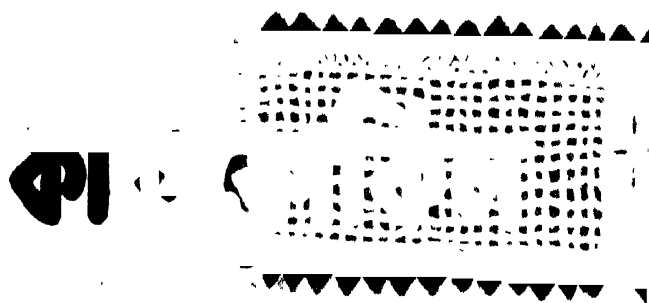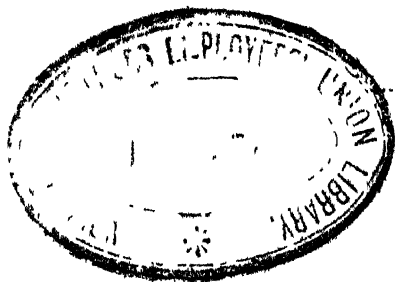
একটুখানি পথ। ট্রামে এলে পাঁচ মিনিট, হাঁটলে মিনিট কুড়ি। ট্রামেই এলো অপর্ণা। একহাতে সব কাজ সেরে, সংসার গুছিয়ে ছেলেটাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আবার যথাসময়ে এসে পৌঁছোনো সত্যি একটু অসম্ভব। তবু অনেক চেষ্টা করেছে ও। পারেনি। সাড়ে দশটায় আসার কথা অথচ এগারটা প্রায় বাজে।

ট্রাম থেকে নেমে পথ চলতি মানুষের ভীড় থেকে নিজের পথটা সহজ করে নেয়। এগিয়ে আসে একেবারে সদর দরজার সামনে। একফালি পথ, ছোট ফুটপাত যেন নিমেষে ফুরোয়।

গেটের সামনে বড়ো বড়ো হরফে সাইনবোর্ড টাঙানো। নব বাণী মন্দির। অপর্ণা দাঁড়াল। হাতের ছোট রুমালে মুখটা মুছল একবার। কপালে এলিয়ে পড়া চুলগুলো টানলো পেছনের দিকে। হাসি পায়। আরও বহুদিন এখানে ও এসেছে। বহুদিন। ছেলেবেলার দুপুরগুলো এখানেই কেটেছে ওর। আজ আবার এসেছে। তবে বই হাতে নয়।

সবাই চেনা লোক। কেমন যেন ভয় ভয় করে। ভয় আর সঙ্কোচ। বেলাদি তো আজও হেড্‌মিষ্ট্রেস, জ্যোতিদি, স্নেহদি হয়ত আজও তেমনি আছেন। সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কেমন যেন বাধল অপর্ণার। গা ভরা লজ্জা। স্কুলের ঘন্টা পড়ে। এগারোটা বাজে। সচকিত হয় অপর্ণা।

অপর্ণা ঢুকলো। সবই জানা। সামনের উঠোনটা পেরিয়ে ডান দিকের প্রথম দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। তারপর বাঁ হাতি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে ডানদিকে অফিস ঘর। এরপর হেড মিস্ট্রেস্ রুম, একেবারে কোণের দিকে শিক্ষয়িত্রীদের বসবার ঘর।

ক্লান্ত মন, শ্রান্ত দেহ।

গুনে গুনে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে আসে অপর্ণা। একগাদা নামডাকার খাতা নিয়ে যাচ্ছিল স্কুলের পুরোনো চাকর শিউশরণ। মুখ দেখেই চিনতে পারে অপর্ণা। শিউশরণ দেখতে পায় অথচ চিনতে পারে না। শুধু ও কেন, হয়তো অনেকেই চিনবে না। ফ্রকপরা, দুই বেণী ঝোলানো ছোট মেয়ে অপর্ণাকে এতদিন পরে শাড়ী জড়ানো দেখে চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। অপর্ণা এগিয়ে যায়। কোণের ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। পা কাঁপে, ভয় হয়। এবারে সঙ্কোচ নয়, সত্যি ভয়।

কুমারী বয়সে বহুবার শো-কেশে সাজানো বাজার পণ্যের মতো গুণাগুণ যাচাই করতে দেওয়া হয়েছে কতগুলো প্রৌঢ়পুরুষ আর প্রাকৃতিরিশকে। স্বেচ্ছায় নয়, বাপ-মায়ের অনুরোধে। সেদিনও ঠিক এমনি বুক কেঁপেছিল, পা টলেছিল। তবে সেটা কিছুটা ভয়, কিছু লজ্জা। আজ লজ্জা নেই, শুধু ভয়।

মরুদ্বীপে জল খোঁজে অপর্ণা। দু'হাতে সাহস কুড়োয়।

মেয়েমন। ভয় তো একটু হবেই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়ের মালা গলায় পড়বে যার সেও তো মেয়েই। তবে?

শুষ্কমরুতেও জল পায় অপর্ণা। অন্ধকারে আলো।

অপর্ণা সাহস পায়। শক্ত হয়। বুকের কাঁপুনি থামে।

কপাট সরিয়ে ঘরে ঢোকে ও। মস্ত বড়ো ঘর। বেশ বড়ো

একটা [illegible]টে টেবিল ঘিরে অনেক মেয়ে। বয়সে ছোট এমন দু'একজন খুঁজে বের করা অবশ্য শক্ত নয় তেমন তবে অপর্ণা যাঁদের নির্ব্বিবাদে মা ডাকতে পারে সংখ্যাধিক্যে তারাই বেশী।

চারিদিকে একবার চোখজোড়া বুলিয়ে নেয় অপর্ণা। নির্বাক সাদা দেয়াল আর কতগুলো বিহ্বল চোখ। চেয়ে থাকে শুধু, কথা জানে না। বোবা যেন সব।

ওদের মনে শঙ্কা—প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম তালিকায় বাড়ল আরও একজন। সকলের চোখ ওর দিকে। বেশ বিব্রত বোধ করে অপর্ণা। এগিয়ে আসে লঘুপায়ে। মাথা নুইয়ে। সকলের মধ্যে চেয়ার টেনে নেয় একখানা।

রাতনিশুতির স্তব্ধতা নামে মধ্যাহ্ন প্রহরে।

চারপাশে বসে আছে যারা তাদের সকলের মুখই দেখতে চাইল অপর্ণা। দেখে ও নিল এক এক করে।

একি!

হঠাৎ জ্বলে উঠল চোখজোড়া! কেঁপে উঠল ভয়ে, শঙ্কায়। এখানে মৃদুলা! আকাশে সিঁদুরে মেঘ যেন। মাথা নোয়াল ও। মৃদুলাকে অস্বীকার করার চেষ্টায়, না দেখার ভান দেখিয়ে।

একটু দূরে বসেছিল মৃদুলা। চেয়ারে গা ছড়িয়ে, হাত দিয়ে ঠোঁট কেটে কেটে হাসছিল মৃদু হাসি। সেই হাসি, অপর্ণার প্রতি এ হাসি চিরন্তন ওর। শ্লেষ আর বিদ্রূপের বিষ।

কিন্তু এ'পরিবেশে মৃদুলাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সবচোখে বিস্ময় বিলিয়ে উঠে দাঁড়াল মৃদুলা। সবাই তাকাল। অপর্ণার দৃষ্টিও কেড়ে নিল ও। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। আবার চোখ সরাল কোণের ওই দেয়ালে টাঙানো ছবির দিকে।

টেবিল থেকে প্লাষ্টিক ব্যাগটি হাতে তুলে নিল মৃদুলা। এগিয়ে এল। অপর্ণার পাশে এসে দাঁড়াল। ওর কাঁধে হাত রেখে বিদ্যুৎ চমকাল ঘরে। শুধু অপর্ণা নয়, সব কটা চোখে, সব চোখে বিস্ময়।

অপর্ণাও তাকাল। সত্যি, অবাক হওয়ারই কথা, চোখ ঝলসানোর মতো মেয়েই মৃদুলা। পুরুষের চোখই শুধু নয়, মেয়েদের চোখও।

'কিরে ?' অপর্ণার কাঁধে হাত রেখে একটু হাসল মৃদুলা।

অপর্ণাও হাসতে চাইল—'এখানে তুই।'

'উদ্দেশ্য এক। চল, একটু বাইরে যাই। উঃ, হাঁপিয়ে উঠেছি এখানে।' মৃদুলা হাত ধরে টানলো অপর্ণাকে।

'চল।' অপর্ণাও উঠল। ওরা দু'জনেই এগিয়ে এল দরজা অবধি। একপশলা সূর্য্যের আলো উপচে পড়ল ওদের গায়ে। রৌদ্রস্পর্শে মৃদুলার গলার কমলহীরের কণ্ঠমালা, কানে প্লাটিনামের দুল ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মেঘজমা কালো আকাশে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমক। সবুজ জর্জেটেও সোনালী জরির আলপনা। গায়ে শাড়ীর রংয়ে রং মেলানো আঁটসাঁট ব্লাউজ। হাওয়ার দমকে দমকে ঢেউ ওঠে সিল্কের ভাঁজে ভাঁজে। পা থেকে কোমরে, বুক জড়ানো আঁচলে। হাত নাড়লে হাত গুনগুনিয়ে ওঠে, ঝলমলায়। আইভরির হাতবলয় আর স্বর্ণকঙ্কনের কাকলী।

করিডরের রেলিংয়ে হাত রেখে অপর্ণা আবার তাকালো মৃদুলার দিকে। সত্যি, মৃদুলা যেন আরও সুন্দর হয়েছে আগের চেয়ে। অপূর্ব্ব ওর দেহদ্যুতি। যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা আকাশকন্যা কোন। বিস্তৃত আকাশে একক তারার মতোই উজ্জ্বল।

কোন মেয়ে কোনদিন সৌন্দর্য্যের স্বীকৃতি দিয়েছে কোন মেয়েকে ইতিহাসে নজির তার কম। কিন্তু শুধু অপর্ণাই নয়, ও ঘরের সবাই স্বীকার করবে, রূপ নিশ্চয়ই আছে মৃদুলার। অপূর্ব্ব, অদ্ভুত।

পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা। করিডরের নিরিবিলি কোণে।

দুজনেই গম্ভীর। কথা বলে না। মন ঢাকে দুজনেই। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে নীচের দিকে। একতলায় ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস একটা। সেদিকেই চোখ।

'আজও কি তোর রাগ ভাঙেনি।' মৃদুলা তাকাল অপর্ণার দিকে।

'না, পাঁচটা বছর তো ফুরোলো। এখনও কি ওসব মনে করে' রাখব নাকি? তুই রেখেছিস?' কষ্ট করে একটু হাসতে চাইল অপর্ণা।

'রাখিনি! তবে মনে হয় রোজই। প্রতিমুহূর্তে ওসব কথা ভাবি।' মৃদুলার বুক নিংড়ে হঠাৎ যেন ব্যথার বাষ্প বেরিয়ে আসে।

'আমার মনে হয়না ওসব কথা। মন থেকে ধুয়ে মুছে সরিয়ে দিয়েছি ওসব।'

'সত্যি, অকারণে, কি ব্যবহারই না করেছি আমরা দুজন।'

'সত্যি।' অপর্ণাও কথাটার সত্যতা বুঝল—'সেদিন আড়ি পেতেছিলাম কিন্তু আবার যে এমনি ভাবে নতুন করে ভাব হবে ভাবতে পারিনি।'

সত্যি একদিন ছিল যেদিন এ ওর দিকে তাকাত না। পাশ কেটে যেতে হলে দুজন দুজনের দিকে তাকাত আড়চোখে। চোখের আগুনে পোড়াতে চাইত একজন অন্যজনকে। একে কমনরুমে ঢুকতে দেখলে ও দ্রুত বেরিয়ে যেতো বাইরে, এ যদি ভেতরে থাকত তবে ও ঢুকত না কমনরুমে।

'সেদিনের ওই দিনগুলোর জন্যে তোর কি কোন দুঃখ হয় না অপু? কোন অনুশোচনা?' উত্তর পাওয়ার জন্যেই যেন অপর্ণার চোখে চোখ রাখল মৃদুলা।

'অনুশোচনা ? প্রথম প্রথম কিছুদিন মনে হয়েছিল জীবনটা বুঝি সত্যি নষ্ট হয়ে গেল। তাই একরকম জোর করেই বিয়ে করলাম। ইচ্ছে ছিল না, তবু করলাম। পুরোনো জীবনটাকে ভুলে যেতে চাইলাম। জোর করে ভুললাম। আজ আমি সুখেই আছি মৃদু। কিন্তু একটি গোপন কথা, পুরাণো জীবনের একটা কথা কাউকে বলিনি। ওঁকেও না।'

'বলিসনি কেন ? প্রেমে পড়া কি অপরাধ ? বিয়ের আগে তো অনেক মেয়েই প্রেম করে, অনেক ছেলেই অনেক কিছু করে কিন্তু তা কি অপরাধ ? ভুলে গেলেও কি সে পাপমুক্ত হয়না অপু।'

মৃদুলার চোখের কালো মণিটা ভালো করে লক্ষ্য করল অপর্ণা। সত্যি কি কিছু জানে না মৃদুলা। কিছুই জানে না ?

প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল অপর্ণা। বলল—'তারপর, খবর কি সুন্দর ? স্বামী নিয়ে ভালো আছিস নিশ্চয়ই।'

'ভালো, হ্যাঁ, ভালই বলতে হবে।' মৃদুলাও যেন মনের কোণে এক গোপন ব্যথা লুকোতে চায়—'ধনী স্বামী, বলিষ্ঠ যুবক।' মৃদুলা ব্যথার হাসি হাসল।

'তোর কথাগুলো কেমন যেন মনে হচ্ছে মৃদু। সত্যি কি সুখী হতে পারিসনি ? ভালোবাসার যুদ্ধে সেদিন জিতেছিলি তুই, হেরেছিলাম আমি। তারপরও সুখী হতে পারিসনি ?' বান্ধবীর দিকে তাকাল অপর্ণা।

'আজ কি মনে হয় জানিস ? সত্যিকারের জয় হয়তো তোরই হয়েছিল। সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝছি। মনে হচ্ছে সেদিনের সেই দুর্বলতা যদি ঢাকতে পারতাম তোর মতো, যদি এড়াতে পারতাম ওকে তবে হয়তো এমন করে নষ্ট হত না জীবনটা।' মৃদুলার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

'কেন?' অবাক হয়ে তাকায় অপর্ণা—'সুব্রত তো তোকে এত ভালবাসতো, এত প্রেম কোথায় গেল তবে?'

'পরিহাস করছিস?'

'পরিহাস নয়। সত্যি বলছি। আশ্চর্য লাগছে আমার।'

'আরও অবাক হবি যখন দেখবি ওকে। সানবীম ট্যালবট থেকে নেমে ও যখন হাওয়াইয়ান সার্ট আর শার্কস্কিনের ফুল প্যাণ্ট পরে এসে দাঁড়াত সকলের সামনে তখন ওর উদ্ধত যৌবন ঝলসে দিতো আমাদের চোখ। আমার, তোর আর সব মেয়েরই। কিন্তু ওর ট্যালবট নয়, ওকে মানুষ হিসেবে ভালবেসেছিলাম শুধু আমি আর তুই। তারপর তুইও সরে পড়লি একদিন। সেদিন বড়ো ভাল লেগেছিল পৃথিবীটা। অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। ঘরের মত নিয়েই বিয়ে করলাম ওকে। ভাবলাম সুখী হবো।' মৃদুলা ধীরে ধীরে বলল কথাগুলো। শান্ত, মোলায়েম ওর গলা—'কিন্তু জানিস অপু। আজ বুঝেছি কি অপরাধ, কতবড়ো ভুল করেছিলাম সেদিন। বাবার ব্যবসাটা ঠিক ভাবেই ও চালিয়ে নিয়েছে। অনেক টাকা ওর, মুঠো মুঠো টাকা। কিন্তু অপু, ওকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম। ছেলেরা বড়ো বেশী উচ্ছল, আবেগটা বড়ো বেশী ওদের। আমরা যা চাপতে পারি ওরা তা পারে না। কিন্তু যে মেয়ে এ দেখেই বিশ্বাস করবে ওদের সেই প্রতারিত হবে। ঠিক আমার মতো। পুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক ঝরে ঝরে পড়ে আর মেয়েদের জীবনে তা চিরদিনের দাগ। সাদা কাগজে কালো কালির মতো।' মৃদুলার বুকের জমাট বাঁধা ব্যথার বাষ্প উপচে পড়তে চায়।

'সুব্রতকে আমি চিনেছিলাম। আর চিনেছিলাম বলেই সরে পড়েছিলাম। এড়িয়েছিলাম ওকে।' ডানহাতে বাঁ-হাতের চুড়িগুলো নাড়তে নাড়তে বলল অপর্ণা।

'সে তোর সৌভাগ্য। ঠিক সময় মতো তুই বাঁচিয়েছিলি নিজেকে। রেহাই পেয়েছিলি। আমি পারিনি। একদিনের ভুলে সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছি, আত্মহত্যা করেছি।' মৃদুলা হঠাৎ অপর্ণার একটা হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিল। কণ্ঠে ওর ভরা আবেগ—'সত্যি বলতো অপু, হঠাৎ সেদিন তুই কলেজ ছেড়েছিলি কেন? সেকি শুধু ওকে চাসনি বলেই?'

'সবই তো জানিস।'

'না, কিছুই তো জানিনে আমি।'

'কেন, সুব্রত বলেনি কিছু?'

'না।'

অপর্ণা থামল। ভাবল একটু—'সত্যি তাই, সুব্রতর যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে ওকে এড়ানো ছাড়া উপায়ও ছিলনা আমার। ভেবেছিলাম, তোকেও সাবধান করে দেব। কিন্তু জানতাম, তুই আমায় বিশ্বাস করবি না। ভাববি শয়তানী করে নিজের পথ হয়তো পরিষ্কার করছি আমি। সত্যি বল, সে মনই তো ছিল সেদিন তোর। নয় কি।'

'সত্যি তাই। কিন্তু অপু আজ যদি কোন ছেলেমেয়ের ভালবাসা বাসির কথা শুনি তবে হাসি মনে মনে। দুঃখ হয় ওদের জন্তে। ওদের ভবিষ্যতের জন্তে। প্রেম করাই ভাল, বিয়ে করা উচিত নয় কখনও।' বুকের গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসে হতাশার শ্বাস। ব্যথার বিষ।

'সব পুরুষই তো আর সুব্রত নয়।'

'হতেও তো পারে।'

চুপ করে দু'জনেই। দুজনেরই চোখ একদিকে। নীচের তলায় ওই ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাসের ওপর।

'জানিস অপু, তুই যখন কলেজ ছেড়ে চলে গেলি তখন ছেলেমেয়ের

মহলে মহলে, মেয়েদের কমনরুমে এ'নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল অনেক। প্রফেসাররাও নাকি বলাবলি করতেন নিজেদের মধ্যে। আর সুব্রত কি বলত জানিস?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অপর্ণা। এ'কথাটার উত্তরই বহুদিন ধরে চাইছিল ও—'কি বলত?'

'বলত, ও নাকি স্পষ্ট তোকে জানিয়ে দিয়েছে তোকে বিয়ে করা ওর পক্ষে অসম্ভব। তারপরই নাকি তুই কলেজ ছেড়েছিস। সত্যি অপু শুধুই এই জন্যে?'

কেঁপে উঠল অপর্ণা—'সত্যি, সত্যি কি এই কথা বলেছে সুব্রত।'

'তাইতো বলতে শুনেছি। আমাকেও তাই বলেছে।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলল অপর্ণা—'সত্যি মৃদু, তাই। ও কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে গেলাম। সেখানে পুরুষ নেই, মেয়েদের কলেজ। পুরোণো কলেজে কি চঞ্চল মেয়েই না ছিলাম আমি। প্রচুর আনন্দ ছিলো, হাসি ছিল মনে কিন্তু সুব্রত আমার সমস্ত জীবন ঘুরিয়ে দিল নতুন করে। গম্ভীর হলাম ভারিক্কি বুড়ীদের মতো। সিরিয়সও হলাম আগের চেয়ে অনেক বেশী। নতুন কলেজে পড়াশুনায় মন দিলাম। সুব্রতর কথা জানালাম না কাউকে। বাবা জানলেন, মা জানলেন। কিন্তু কলঙ্কটা বাতাসে ছড়াল না। অনেক কষ্টে গোপন করলাম। ইচ্ছে করেই দেখা করিনি কোন কলেজ সতীর্থের সঙ্গে। ভুলে গেলাম সব। কলেজ পেরিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে এসে আবার দেখা হল সকলের সঙ্গে। শুনলাম—তোরা বিয়ে করেছিস। জানিস মৃদু, শুনে কি আনন্দই না আমার হয়েছিল সেদিন। মনে হয়েছিল, বুক থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।'

'তারপরই বুঝি বিয়ে করলি তুই?'

'না, ঠিক তারপরই নয় তবে এম,এ দিয়ে আর দেরী করিনি বেশী। কোন ঘটক ওঁকে আবিষ্কার করেনি আমার জন্তে, আমিই খুঁজে নিয়েছিলাম। দরিদ্র অধ্যাপক। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, পণ্ডিত মানুষ। আর কারো ভালো না লাগুক আমার তো আজও ভালো লাগে।'

'সুখেই আছিস তা'হলে।' মৃদুলা ভ্যানিটী ব্যাগটা এ'হাত থেকে ও'হাতে সরাল।

'হ্যাঁ ভালোই। দাম্পত্য সুখ প্রচুর কিন্তু ওঁর একার আয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। তাইতো এখানে এসেছি। অর্থকরী স্বাচ্ছন্দ্য এলে জীবনের অবশিষ্ট রিক্ততাটুকুও ভ'রে উঠবে পূর্ণতায়।'

কথাগুলো শোনে মৃদুলা। নীচের দিকে চোখ রেখে কান পেতে শোনে। ওর পলকহীন চোখের আগুন ঠিকরে পড়ে একতলায়।

অপর্ণা আবার কথার গায়ে কথা জড়ায়—'তোর কি, উপযুক্ত স্বামী। ভরাটে সংসার। সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি মৃদু ; আমাকে বোবা করেছিস তুই।'

'কেন ?' ঠোঁটের কোণে হাসির টুকরোটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে মৃদুলার। বলে—'অবাক করলাম কি রকম ?'

'কলেজের অনেক মেয়েকে এখানে আশা ক'রতে পারি কিন্তু তুই ?'

'কেন যোগ্য নই নাকি ?'

'ছিঃ, আমি কি তাই বললাম।' অপর্ণা জিভ কাটে—'সামান্ত একশো টাকার চাকরীর জন্তে তুই এসেছিস এখানে ! সেটাই বিস্ময়। সত্যি কি তুই চাকরীর জন্তে এসেছিস মৃদু না অন্ত কোন কারণে ?' অপর্ণা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মৃদুলার কাঁধে হাত রাখে ও।

অপর্ণার ব্যগ্রতা দেখে হাসি আসে মৃদুলার—'হ্যাঁ, সত্যি আমি চাকরী চাই অপু। দশটা পাঁচটার মাষ্টারী।'

'রাজরাণী হয়ে ভিক্ষের জন্তে হাত বাড়িয়েছিস।' অপর্ণা থামে। মনে মনে ভাবে—তবে কি, তবে কি ঝড়ের ঝাপট ওর জীর্ণ ঘরেই শুধু নয়, শক্ত ইমারতেও কাঁপুনি তুলেছে।

'শুধু কি টাকার প্রয়োজনেই মানুষ চাকরী করে, অপু?'

'আমার তো মনে হয় তাই।'

'মেয়েদের বেলায়?'

'সেটাও তেমনি সত্যি।' সহজ প্রশ্ন, উত্তর আরও সহজ।

'আমি তার ব্যতিক্রম অপু।' হঠাৎ গম্ভীর হয় মৃদুলা—'অর্থপ্রাচুর্য্য হয়তো আমার আছে কিন্তু সুখ নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। এমন অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা কেটেছে আমার যখন মনে হয়েছে আত্মহত্যা করি। এত বড়ো বাড়ী, এতগুলো ঘর কিন্তু মনে হয় ফেলে দেওয়া কাপড়ের মতোই এর দাম। ছোটঘর, সাধারণ জীবন এর চেয়ে অনেক হয়তো ভালো, অবশ্য বুকভরা স্নেহ, ভালবাসা থাকে যদি।' এলিয়ে পড়া জর্জেট সিল্কের আঁচলা কাঁধে তুলল মৃদুলা।

কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা আছে মৃদুলার বুকে। অপর্ণা বোঝে।

'বড়ো একা, বড় অসহায় আমি অপু। কাজ দিয়ে দুপুরটা ভ'রে রাখতে চাই বলেই চাকরী খুঁজছি আমি। টাকার জন্তে নয়।'

আশ্চর্য্য। সময় কাটাতে চাকরী খোঁজে মৃদুলা। ওটা ওর বিলাস। শাড়ীতে সুরভিনির্য্যাস ছড়ানোর মতই প্রয়োজন ওর চাকরীর। আর অপর্ণার প্রয়োজন টাকার, চাকরী ওর জীবিকা। অপর্ণা মূক হয়ে থাকে। নীচের তলার মেয়েগুলোর দিকে চোখ রেখে

কথা শোনে, কথা বলে না। দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মৌনমুহূর্ত গোণে। কাটে কিছুক্ষণ।

'আচ্ছা অপু, তোর বিয়ে আমার অনেক পরে হয়েছে, তাই না।'

'হ্যাঁ। প্রায় দুবছর পর।'

'মা হয়েছিস?' মেয়েলী কৌতুকে হাসল মৃদুলা। এ হাসিও জোর করে হাসতে চাওয়া।

'হ্যাঁ।' অপর্ণাও হাসল একটু—'একটি ছেলে। বছোর তিনেক বয়স। আর তোর?' পাল্টা প্রশ্ন করল অপর্ণা।

'আমার? মেয়ে হলেই সবাই মা হয় না অপু।'

'হয়নি কিছু?' সহানুভূতির চোখে তাকাল অপর্ণা।

'না, সন্তান জননের শক্তি আমার নেই।'

'সত্যি, এ তোর দুর্ভাগ্য।' মৃদুলার চোখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল অপর্ণা। অবাক হল—মৃদুলার চোখের কোণে জল!

আরও একটা হতাশার শ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল মৃদুলা। চামড়া ঢাকা মানুষের অন্তর্দেহ দেখে না কেউ। যদি দেখা যেত তবে বুঝত অপর্ণা মৃদুলার বুকের সুখকোণ শুধু রিক্ততায় ভরা। সে রিক্তসত্তায় ভ'রে রেখেছে যে দেহাবরণ সে ওর ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্য। অকারণে সারা দেহে বস্ত্রাবৃত হয়ে শ্বেতকুষ্ঠ ঢাকার প্রয়াস যেন। কেউ জানে না কিন্তু নিজে জ্বলে, পুড়ে মরে। এ'কথাটাই জানাতে চায় মৃদুলা, বোঝাতে চায়।

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রেলিং ছেড়ে সরে দাঁড়াল মৃদুলা। বলল—'চল যাই।'

অপর্ণাও সরে এল। বলল—'চল।'

মিস্ট্রেস রুম পেরিয়ে এসে মৃদুলা দাঁড়াল অফিসঘরের সামনে।

তাকাল অপর্ণার চোখের দিকে—'সত্যি কি চাকরীটা তোর দরকার ?'

অপর্ণাও তাকাল ওর দিকে—'ভাবিস কি তুই। সব মেয়েকেই নিজের মতো মনে করিস নাকি ?'

মৃদুলা হাসল—'তাহলে তুই ভেতরে গিয়ে বোস, আসছি আমি।'

'কোথায় যাচ্ছিস, দাঁড়া।' বাধা দেয় অপর্ণা।

অপর্ণাকে একবারে কোণের দিকে নিয়ে এল মৃদুলা। আধো অন্ধকারে। ফিসফিসয়ে বলল কানে কানে,—'চুপি চুপি বলি, শোন। বলিসনে কাউকে—ওরা মিষ্ট্রেস নেবে মাত্র দু'জন। একজন আমি আর অন্যজন তোদের কেউ।'

'তোকে নেবে তুই জানলি কেমন ক'রে ?' অপর্ণা অবাক হয়।

'এই স্কুলের সেক্রেটারী ওর-আমার জানা লোক। আমি জানি চাকরী হয়ে গেছে আমার। তোরও যাতে হয় সে চেষ্টাই করি একটু। মনে হয়—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবে না ওরা।'

'অনর্থক আমার জন্যে—'

'থাক, থাক, সৌজন্য প্রকাশ না হয় পরেই করিস। যদি কিছু হয় অবশ্য।' অপর্ণার কাঁধে মৃদুলা হাত দিয়ে একটু মৃদু আঘাত করে। মৃদুলা এগিয়ে গেল। ঢুকল হেড-মিষ্ট্রেস রুমে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখল অপর্ণা।

রুমাল দিয়ে ঠোঁট ঢেকে আবার সকলের মধ্যে এসে বসল অপর্ণা। সেই ঘরে, সেই সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ধারে কাঠের চেয়ারে।

মুহূর্ত কাটে নীরব প্রতিক্ষায়।

ডাক আসে। একে একে বাইরে যায় প্রার্থীনীরা। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয় অপর্ণার। সব প্রহসন, ও জানে সবাই হতাশ হবে।

অশান্ত মন আরও চঞ্চল হয়, ভীতমন শুধু দুঃস্বপ্নই দেখে।

হ'বে না। হ'তে পারে না।

হ'ল। কর্তৃপক্ষের চেয়ারের পাশে মৃদুলাকে দেখেই বুঝেছিল অপর্ণা চাকরী হ'য়ে গেছে ওর। হ'লও তাই। সবাই চলে গেলে ওর হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এ'ল মৃদুলা। অপর্ণার কানে উপহার দিল কর্তৃপক্ষের শেষ কথা।

কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল অপর্ণা—'সত্যি মৃদু, অনেক করলি তুই আমার জন্যে। মনে রাখব তোকে।'

'রাখিস!' ঠোঁটের হাসিটা সারামুখে ছড়াল মৃদুলা—'সত্যি ভাবতেও অবাক লাগছে অপু, আর কেউ নয়, শেষে আমিই তোর জন্যে এত করলাম।'

অপর্ণাও হাসল—'আর আমার কাছেও এ আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। তোর সঙ্গে এমনি ক'রে আবার ভাব হবে, দেখা হবে গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের মতো এ আমি ভাবতেও পারি নি।'

দু'জনেই নেমে এল। দোতলা থেকে একতলায়। একেবারে গাড়ী-বারান্দায়। 'ডি সোটো' তৈরীই ছিল। পেছনের দরজা খুলে সরে দাঁড়াল পোষাকী সোফার।

'না, থাক।' গাড়ী পর্য্যন্ত এসে মৃদুলার মুঠো থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো অপর্ণা—'এইটুকু তো পথ, হেঁটেই যাই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে। এবার আয়।' হাত ধরে টেনে ওকে ভেতরে বসাল মৃদুলা। নিজেও বসল পাশে। এককোণে নিজেকে গুটিয়ে রাখল অপর্ণা আর নিজেকে ছড়াল মৃদুলা। কালো পিঁচের পথ। সোজা, সরল। হাওয়ার বেগে উড়ে চলেছে গাড়ীখানা। চৈতালী ঘূর্ণীর বেগে।

'সুব্রতকে বলবি আমার কথা ?'

'বলব।'

'না থাক। ওকে আমিও ভুলেছি, ও-ও যদি ভুলে থাকে, ভুলতে দে।' তোর সঙ্গে দেখা হল বলেই মনে পড়ল ওর কথা।'

না, শুধু মৃদুলার সঙ্গে দেখা হ'ল বলেই নয়, গাড়ীর এ নরম গদিতে গা ছড়িয়েই পুরোণো দিনের সব কথা জেগে উঠল হঠাৎ। সুব্রত আর ওর সানবীম ট্যালবট। ছোট টু-সীটার। চৌরঙ্গীতে সিনেমা, কফি-হাউসে, রেস্টুরেন্টে নইলে লেকের ধারে সবুজ ঘাসে অলস বিকেল-গুলোর কথা হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। ভেসে ওঠে বিস্মৃত জীবনের ভাঙা ভাঙা ছবি। কত হাসি আর কত খেলার দিন। স্বপ্ন ছাওয়া জীবন। অন্যমনস্ক আঙুলের এক টোকায় হঠাৎ ভেঙে যায় সে তাসের ঘর। সুদিনের স্বপ্ন।

'ও ভোলেনি।' অপর্ণার কথার সুতো টানলো মৃদুলা—'প্রায়ই বলে তোর কথা।'

'তাই নাকি!' অপর্ণা হাসল—'বলিস, আমি মেয়ে। মনে রাখার মানুষকেই মনে রাখি শুধু আর সবাইকেই ভুলে যাই।'

'ওকে মনে রাখতেও তুই চাসনে আজকাল?'

'না, আজকের আকাশের ছিঁড়ে যাওয়া তারাকে কাল কে মনে রাখে বল্।'

মৃদুলা চুপ করে শোনে। শুধুই শোনে, কথা বলে না।

আরও কয়েক সেকেণ্ড মাত্র চলল গাড়ীটা। লাল বাড়ীটার পাশে ছোট একটা গলি। অপর্ণার নির্দ্দেশে গাড়ীটা থামল।

'কোন্ বাড়ী?' মৃদুলা মাথা বাড়াল বাইরে।

'এ' গলির সাত নম্বর!'

'তবে, এখানে কেন মতিলাল।'

'থাক।' অপর্ণা ততক্ষণে রাস্তায় নেমেছে—'আয় মৃদু, যাবি ভেতরে?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল মৃদুলা—'আজ থাক ভাই, আসব, নিশ্চয়ই আসব একদিন।'

বেশী জোর করল না অপর্ণা। ও চায়না আসুক মৃদুলা, আসুক সুব্রত। ওর সাজানো স্বর্গে ও চায়না ওদের আনতে।

'কবে আসবি?'

'দেখা তো রোজই হবে এবার থেকে। আসব একদিন।' মৃদু হেসে অপর্ণার একটা হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিল মৃদুলা। চাপ দিল একটু—'আজ আসি কেমন?'

কমলহীরের দ্যুতিময় স্বর্ণহার, প্লাটিনামের দুল। আবার দেখল অপর্ণা। চোখ ধাঁধালো।

'যাই, কেমন?' মৃদুলা আবার বলল।

'আচ্ছা আয়।' ঘাড় নাড়ল অপর্ণা।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল ড্রাইভার। হাত ছাড়ল মৃদুলা। অপর্ণাও।

চলে গেল ডি-সোটো। অপর্ণা তাকিয়ে থাকে। মসৃণ ইস্পাত সূর্য্যালোকে অদ্ভুত উজ্জ্বল।

স্কুল মাষ্টারীর দিনগুলো বেশ লাগছে অপর্ণার। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন স্বাদ। ভালই লাগে। বোধ হয় ঘরের বাইরে এই একমাত্র কাজ যা মেয়েরা করতে পারে। সকাল দশটায় যাওয়া আর বিকেল পাঁচটায় ঘরে ফেরা। এরই মধ্যে অপর্ণার ব্যস্ত দ্বিপ্রহর।

মৃদুলাও আসে। হেঁটে নয়, ট্রামে নয়, নিজেরই গাড়ীতে। সময়ে অবসরে আড়ালে আবডালে কথা বলে দু'জনে। অনেক কথা। উচ্ছল

যৌবনের সুর আর নেই, যৌবন সন্ধ্যায় নুয়ে পড়েছে দু'জনেই। বর্ষার ভরা নদী শীতে শুকোলে ঠিক যেমন হয়।

একদিন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবার দিনকয়েক পরেই। মৃদুলা নামল গাড়ী থেকে। ছোট একটি মেয়ে বুকে জড়িয়ে। ওপর থেকে সব দেখল অপর্ণা। ছোট্ট মেয়ে। তিন কি চার হবে বয়স। আশ্চর্য্য, মৃদুলারই মেয়ে বলে মনে হয়। গায়ের রংয়েই শুধু নয়, রূপেও।

কিন্তু !

অপর্ণা ছুটে এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির মুখে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল মৃদুলা। ডানহাতে মেয়েটার নরম গালটা চেপে, নাক ঘসে, ও গালে আদর করল। বলল—'বল তো কে ?'

'কি ক'রে বলব ?'

'কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিস এ মুখের সঙ্গে অন্য কোন মুখের ?' মৃদুলা উঠে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। ভালো করে একটু দেখল অপর্ণা। ভাবল কিছুক্ষণ—'না, মনে পড়ছে না তো !'

'কিন্তু আশ্চর্য্য, সবাই বলে এ মুখের সঙ্গে ওর নাকি অদ্ভুত মিল।' আমারও তো তাই মনে হয়।'

'কি বলতে চাস তুই।' হঠাৎ যেন অপর্ণা কেমন হয়ে ওঠে।

'আমার মেয়ে।' চলতে চলতে বলল মৃদুলা—'ভাবছি ভর্ত্তি ক'রে দেব একেবারে গোড়ার ক্লাসে। আসবে আমার সঙ্গে, যাবেও আমারই সঙ্গে।'

'তোর মেয়ে !' থমকে দাঁড়ায় অপর্ণা—"তবে যে বলেছিলি—'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে। বেড়াল পোষাব সখ ছিল ছেলেবেলায়। বেড়াল না পেয়ে এখন মানুষ পুষছি।'

'তার মানে?'

'মানে আবার কি! মা হ'তে চাইতাম। কিন্তু অক্ষম আমি। কাঁদতামও এ'জন্যে। একদিন ওই কোত্থেকে যেন কুড়িয়ে আনল একে। বলল—মা হ'তে চাও, হও। অনেক খুঁজে এনেছি। লোকে বলে অনেকটা নাকি আমারই মতো দেখতে। দেখো তো, সত্যি কিনা।" দেখলাম, হুবহু না মিললেও বেশ একটা সাদৃশ্য আছে ঠিকই। কার মেয়ে জানিনে। কে বাপ, কে মা তাও জানিনে। জানতেও চাইনে। যারই হোক, ওকে বুকে চেপে নিয়েছি। মা হ'তে পেরেছি। মানুষের মা। যার পরিচয় হ'বে আমার মেয়ে বলে। যাকে আমি নিজের হাতে গড়ব, মানুষ করব। সে পাওয়াই কি আমার অনেক পাওয়া নয় অপু?" গভীর স্নেহে মেয়েটার গালে একটা চুমু খেল মৃদুলা। এগিয়ে দিয়ে বলল—'নে ধর, আদর কর।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপর্ণা। একমুঠো নরম শরীর। মৃদুলার স্বামীর মুখ থেকে রূপ ধার নেওয়া সুন্দর একটা মুখ। কিন্তু ওর রং তো ফর্সা নয় মেয়েটার মতো। তবে?

অপর্ণার সারা শরীরে একটা রক্ত দোলা দিয়ে গেল যেন। চোখের জল যেন ছিটকে বেরোতে চায় বাঁধ না মানা নদীর মতো। ভারী গলায় বলল ও—"আজ আমি যাই মৃদু। মাথাটা বড্ড ধরেছে। হয়তো জ্বর আসবে।" দ্রুতপায়ে নেমে এল অপর্ণা।

'শোন, শোন অপু।' বিস্ময়ে হতবাক মৃদুলা ডাকল পেছন থেকে। শুনল না অপর্ণা। শুনেও শুনল না। মুখস্ত করা সিঁড়িগুলো ভেঙে ভেঙে পথে এসে দাঁড়াল। ভেঙে পড়ল কান্নায়। রুমাল দিয়ে চোখ চেপে পথ চলতে সুরু করল আবার। সই করা হল না অ্যাটেণ্ডেন্সে। যাক্, আর এখানে নয়, কালই লিখবে শেষ চিঠি। রেজিগ্‌নেসন লেটার।
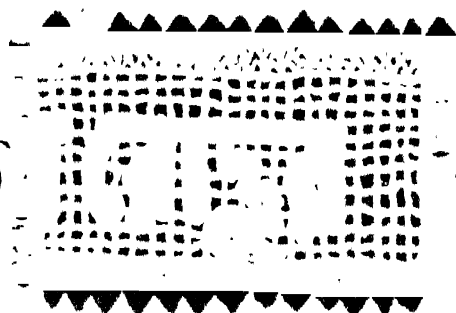
কৃষ্ণারাতের মধ্যপ্রহরই হোক আর শুক্লাতিথির শুভ্রযামিনীই হোক উপকূলের মাটী ছোঁওয়া 'আলোকস্তম্ভ' যেমন দূর-দিগন্তের সাগরতরীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়, 'আনন্দময়ী ভবন'ও তেমনি এ পথের প্রতিটি মানুষের বিস্ময়। বহুবাজার ষ্ট্রীটকে দুহাতে দুদিকে ছড়িয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যেখান থেকে নতুন নামে সোজা এগিয়ে এসেছে দক্ষিণের দিকে সেখান থেকে, অথবা আরও দূর থেকে এ প্রাসাদ চোখে পড়ে সকলের। এটা রাজপথ নয়, উপরাজপথ। ট্রামলাইন দাগ কাটেনি এ পথের কালো পিচে, বাসও চলে না। চলে শুধু ট্যাক্সি আর লরী, রিক্সা আর মানুষ। রাজপথের মতোই চওড়া এ পথ, সাড়ীর পাড়ের মতোই দুধারে দুটো সরু ফুটপাত। সাজানো বিপণি আর মেঘমিতা প্রাসাদের সারি। একে ছাপিয়ে ও যেন চাঁদ ধরতে চায়। ছেলেমানুষের ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ির মতো।

মোড় থেকে 'আনন্দময়ী ভবনের' আপাঙ্গ দেখা গেলেও আরও কয়েক পা এগোতে হবে ওর কাছে যেতে হলে। মস্তো বড়ো বাড়ী। ইট আর কংক্রীটের বস্তী। মৌচাকও বলা চলে। মৌমাছিদের খোপের মতোই ছোট ছোট কতগুলো ঘর। দুটো কি তিনটে নিয়ে গুটিকতক নিরিবিলি আর একক সংসার। মধ্যবিত্তের মহীরুহ। ঝড়ের ঝাপটে বিব্রত বিহঙ্গের মতো এরা নীড় বাঁধে এখানে। ঝড় আসে আসুক, ভূকম্পনে ভেঙে যাক পৃথিবী তবু এ পাষাণ প্রাসাদ ধ্বসে যাবে না,

মাটিতে পড়ে লুটোবে না কোনদিন এ আশায় নীড় বাঁধে তারা, স্বপ্ন আঁকে চোখে।

দুবিঘা জমির ওপর সাততলা প্রাসাদচূড়া দেখে হয়তো অবাক হয় অনেকেই। চারপাশের আর সব বাড়ীর মধ্যে এ যেন তারার ভীড়ে শুক-তারার মতো। কিন্তু এর অন্তঃপুরের কাহিনী কেউ জানে না। কেউ না। বাড়ীর মালিক মানুষ চেনেন না, চেনেন টাকা। মাসের শেষে কড়া আর ক্রান্তি মিলিয়ে মাসিক প্রণামী পেলেই তিনি খুসী। আশ্রয়দানের দক্ষিণা। কিন্তু একজন, একটি ব্যক্তি এ বাড়ীর সব মানুষেরই সুহৃদ। 'আনন্দময়ী ভবন' ছেড়ে চলে গেছে যারা তাদের ও বিদায় দিয়েছে, যারা এসেছে নতুন, তাদের ও অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলেছে পরম আত্মীয়ের মতো। এ পাষাণপুরীর প্রতিটি ইট-পাথরের সঙ্গে যেন মিতালী ছিল ওর, পায়ের নীচের বাঁধানো মেঝে যেন পা জড়িয়ে ছিলো। সত্যি, একক ভাবে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে, প্রতিটি সংসারের সঙ্গে, ব্যাপক-ভাবে সমগ্র 'আনন্দময়ী ভবনের' সঙ্গে যেন একাত্ম ছিল মানদা। মানদা! এ প্রাসাদের এক জীবন্ত ইতিহাস।

কিন্তু মানদা আজ আর নেই। প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে বার্ধক্য ছুঁতে পারেনি ও। হঠাৎ চমক বিদ্যুতের মতো 'আনন্দময়ী ভবন' একদিন কেঁপে উঠেছিল খবরটা শুনে। কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতোই মিলিয়ে যেতে পারত। অথচ যায়নি। মানদাকে ভুলতে পারেনি কেউ। ভুলতে দেয়নি বাতাসী।

বাতাসী।

মানদার মেয়ে বাতাসী। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে চুপে চুপে আসে, চুপে চুপে যায়। তাকায় না কোনদিকে, মাথা তোলে না। উপায় নেই তুলবার। চোখ তুলে তাকালেই কতগুলো পুরুষের চোখে

চোখ পড়ে যাবে। ওরা চেয়েই আছে, শুধু বাতাসীই তাকায় না বলে। নইলে কতশত চোখের আগুনে পুড়ে যেত ওর চোখের মণি। প্রায় সব মেয়ের চোখেই থাকে এ চোখের জ্বালা। কমলালেবুর খোশা নিংড়ানো রসের চেয়েও তীব্র যেন পুরুষের চোখ।

আকাশের রং সাদা না হলেও নীল আকাশ যদি কুশ্রী না হয় বাতাসীও কুৎসিত নয় তবে। নিখুঁত এক কুমারী অঙ্গনা। কোন প্রসাধন নেই, অঙ্গসজ্জাও বাহুল্যহীন। নিতান্তই সস্তা দামের মিলের সাড়ী ওর দেহাবরণ। পাঁচ কি সাত টাকার বেশী যার দাম নয়। স্ফীত যৌবনকে বাঁধবার জন্যে ব্লাউজের প্রয়োজনও অবশ্য হয়, তবে আঁচলের পয়সায় সেটা কোনদিনই কেনেনি বাতাসী। মা-দিদিদের দয়ার দানেই চলে গেছে এতকাল। নতুন নয়, তাদের ছিঁড়ে যাওয়া, ফেলে দেওয়া-গুলোকে ওর নিপুণ হাত নতুন করে নিয়েছে। মেয়ে হয়েও কোনদিন নিজেকে সাজাতে চায়নি বাতাসী। বাবুদের মেয়েদের মতো আরসীর মুখোমুখী ও দাঁড়ায়নি কখনও। মুখের ওপর পাউডারের প্রলেপ তো নয়ই, নিজের আবক্ষ রূপকেও ভালো করে দেখেনি কোনদিন। কানে ওর দুল নেই, কণ্ঠেও নেই কিছু। হাতে অবশ্য চুড়ি আছে। একটি দুটি নয়, অনেক। কাঁচের আর প্লাষ্টিকের। এই কি যথেষ্ট অঙ্গরাগ? কিন্তু তবু, তবু এই পৃথিবীতে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা এ মেয়ের রূপকেও দু'চোখ ভরে পান করে, ওর আলতাহীন পায়ের ছন্দ অপলক চোখে দেখে। বর্ষার ভরানদীর মতো উপচে পড়া যৌবন যার সারা শরীরে টলোমলো, সেই মেয়ে বাতাসী। অষ্টাদশী কুমারীকন্যার চঞ্চল হরিণী চোখ তাই মাতাল করে তাদের, পাগল করে তোলে।

পুরুষ হয়ে জন্ম নেওয়া যদি অপরাধ না হয় মেয়ে হয়ে পৃথিবীতে আসাও তবে দোষের কিছু নয়। কিন্তু জীর্ণ বাঁশের সাঁকো পেরোণোর

মত ভয়ে ভয়ে, শঙ্কিত জীবন নিয়ে তের-তেইশের সেতু পেরোতে হয় মেয়েদের। বড়ো ভয়াবহ এ সময়, বড়ো সঙ্কুল। অথচ এ বয়সকে পেরিয়ে যেতেও পারেনা কোন মেয়ে। মাঘ আর পৌষের শীতের মতো। অবাঞ্ছিত, অথচ এর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। নইলে উপায় নেই। যদি সম্ভব হতো তবে এ জীবন বসন্তকে পেরিয়ে যেত বাতাসী, এড়িয়ে যেত। মায়ের মৃত্যুর পর মাতৃপেশা নিজের করে নিয়েছে কিন্তু নিজেকে ও গড়তে পারেনি মায়ের মতো করে। এক হাতে এ প্রাসাদের প্রতিটি ঘরে কাজ করেছে মানদা, খুসীও করেছে সকলকে। দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য্য থাকলেও তা পারেনি বাতাসী। বড়ো লজ্জা ওর, বড়ো ভয় মনে। তাই নিজের ভালো লাগা গুটিকতক সংসারের কাজ নিজের হাতে রেখে আর সব ছেড়ে দিয়েছে। ছয়, সাত, আট, তের, চৌদ্দ, একুশ, বাইশ, আর আটাশ নম্বর ফ্ল্যাটেই প্রতিদিনের আনাগোনা ওর। সকাল সন্ধ্যায়।

তবু।

তবু কি শান্তি আছে?

তিনতলা চারতলার মাঝপথে অপরিসর ছোট বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়াল বাতাসী। ভয়ে, শঙ্কায়। সিঁদুরে মেঘ দেখা গরুর মতো। ওপর থেকে নীচে নামছিল ধীরেন। ব্রাইল করা চুল থেকে পায়ের ক্রেপসোল পর্য্যন্ত সযত্নে সাজানো ওর সারা শরীর। পরণে কর্ডের প্যান্ট আর গায়ে জামার ওপর চামড়ার জার্কিন। আধাখোলা জীপ কাসন। সার্টের বোতাম না লাগানো গেঞ্জি ঢাকা বুক স্পষ্ট দেখা যায়। প্যান্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে গুনে গুনে সিঁড়ি ভাঙছিল ধীরেন। শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে আর ঠোঁটে হিন্দী-শীষ নিয়ে। বাতাসীকে

দেখেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। শীষের বদলে হাসি ছড়াল ঠোঁটে, বাঁ চোখে কটাক্ষ ছুড়ল শাণিত শরের মতো।

এক কোণে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল বাতাসী। মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। ব্যস্ত হাতে বুকের আঁচলটা টেনে নিল ভালো করে। চোখে যদি চোখ না পড়ত তবে গা ঢেকে সরে পড়ত বাতাসী। না পারলেও চেষ্টা করত পালাবার।

দুজনই স্তব্ধ কিছুক্ষণ। পাথরমূর্তির মতো স্থির অচঞ্চল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল ধীরেন। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গা ছুঁয়ে দাঁড়াল। হাসল। বুকটা কেঁপে উঠল বাতাসীর। হীম হয়ে এল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের কেস খুলল ধীরেন। ঠোঁটে চাপল একখানা। চোখ তুলে এসব দেখল না বাতাসী। অনুমানে বুঝল। সুযোগ খুঁজছিল ও। বেড়াজালের ভেতর একটুকু পালাবার পথ।

সিগারেট ধরাতে মাথা নোয়ালো ধীরেন। জ্বলন্ত কাঠিটা দুহাতে ঢেকে মুখটা আড়াল করতে হল। সে সুযোগেই পালাল বাতাসী। এক দৌড়ে ওপরে উঠে এল। একটা ফেটে-পড়া পুরুষ হাসি কানে ভেসে এল কিন্তু দাঁড়াল না বাতাসী। বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় খিল এঁটে হাঁফ ছাড়ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের কাজ লক্ষ্য করছিলেন সুনীতি দেবী। শেখাচ্ছিলেন, তদারক করছিলেন। হাতে উলের সুতো আর কাঁটা।

'দাদাবাবু কোথায় গেলেন মা?' সামনে এসে দাঁড়ালো বাতাসী।

'জানিনে তো।' দু'ঘর সোজা করে একটা উল্টোঘর তুললেন তিনি—'কেন, সে খোঁজে দরকার কি তোর? নিজের কাজ সেরে চলে যা।'

ধমক খেয়ে চুপ করলো বাতাসী। নইলে আরও কয়েকটা কথা বলার ছিল ওর। আস্তে আস্তে এঁটো বাসনের পাঁজা হাতে তুলে নিল ও। এগিয়ে এলো বাথরুমের দিকে।

ছিঃ ছিঃ, এই নাকি ভদ্দরলোক? বাবুদের বাড়ীর ছেলে হওয়ার মূল্য কি তবে, কতটুকু দাম? দাদাবাবু সম্বন্ধে আর কেউ কিছু না জানুক, বাতাসী সব জানে। একটা পাশও নাকি দিতে পারেনি। আর নাকি পড়বেও না। না পড়ুক, তাই বলে ভদ্দরলোকের ছেলে অমন হয়ে যাবে? ছিঃ!

কিন্তু ও ঘরের দিদিমণি? যেন আকাশ আর পাতাল। সত্যি অনেক সময় ভাবে বাতাসী। মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতো ও ঘরের দিদিমণি তবে হয়তো এমন করে কষ্ট করতে হতো না বুড়োবাবুকে। সারাদিনের হাড়গুঁড়ো করা খাটুনি, তার ওপর ঘরের কাজ! বাজার করা, রেশন আনা, সবই তো করতে হয় তাঁকে। এ বুড়ো বয়সে কত আর সয়। বড়ো কষ্ট হয় বাতাসীর। মায়া হয়। অনেক কথা ভাবতে ভাবতে বাসনগুলোয় ছাই ঘষা শেষ হয়। কলের জলে সেগুলো ধুয়ে ফেলে বাতাসী। ফিরে আসে রান্নাঘরে। মশলা পিশতে বসে।

'যাবার আগে একবার দেখা করে যাসতো বাতাসী।' শোবার ঘর থেকে সুনীতি দেবীর আদেশ শোনা যায়।

'আচ্ছা মা।' একটু চেঁচিয়েই সাড়া দেয় বাতাসী। ঝুঁকে পড়ে, সারা শরীর দুলিয়ে হলুদগুলো আরো মিহি করে ও। আপন মনেই নিজের কাজ শেষ করে। তারপর ঝাঁটা হাতে শোবার ঘরে এসে ঢোকে। স্প্রিংয়ের খাটে শুয়ে পুলোভার বুনছিলেন সুনীতি দেবী।

'আমায় কিছু বলবেন মা?' বাতাসী ডাকলো।

'ওঃ, হ্যাঁ।' ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন স্থনীতি দেবী—'হঠাৎ তুই মণ্টুর কথা জিজ্ঞেস করলি কেন?'

'না, এমনি।' সহজভাবে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলো বাতাসী। নিজের কাজে মন দিল।

'এসব কিন্তু ভালো নয়। সাবধান করে দিচ্ছি।'

টেবিলের নীচ থেকে ধুলো টানতে টানতে থেমে গেলো বাতাসী। চমকে উঠল।

'মা!' আত্মরক্ষার জন্তে মাথা তুলে দাঁড়ালো বাতাসী।

'থাম্।' মুখের কথা কেড়ে নিলেন স্থনীতি দেবী। গর্জে উঠলেন—'ছেলে আমার যথেষ্ট ভালো। দয়া করে আর ওর মাথাটি খেও না।'

প্রতিবাদ তো দূরের কথা, মাথা পর্য্যন্ত তুলতে পারলো না বাতাসী। ঠোঁট কাঁপছে ওর, গলা শুকিয়ে এসেছে যেন।

স্থনীতি দেবী গলাটা একটু নামিয়ে বললেন—'তাই তো ভাবি, সেদিন রাত্রে মণ্টু হঠাৎ একথা বলল কেন—'বাতাসীকে সারাদিনের ঝি করে নাও মা। বড়ো ভালো মেয়ে। হুঁ, এখন বুঝলাম এত দরদ কেন!'

কান্নার দমকে বাতাসীর ছুচোখ ফেটে পড়লো হঠাৎ। হাতের কাজ অসমাপ্ত রেখেই ছিটকে বেরিয়ে এল ও।

করিডোরের কোণে পা গুটিয়ে বসে পড়ছিলো কুন্তলা। হাতল ভাঙ্গা নিঃশেষিত চায়ের কাপটা পাশে পড়ে আছে। লঘু পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো বাতাসী—'দিদিমণি!'

'কিরে বাতাসী? কি হলো?' বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে বইটা বন্ধ করলো কুন্তলা। অবাক হলো বাতাসীর চোখে জল দেখে—'তুই কাঁদছিস্?'

বাতাসী চুপ। আঁচল দিয়ে মুখ চোখ ঢাকা।

'কিরে, কি হয়েছে বল্?' কুন্তলা উঠে এলো। বাতাসীর কাছে এসে ওর দুটো কাঁধ ধরলো।

মাথা নীচু করে তবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো বাতাসী। এবার ভেঙ্গে পড়লো। কুন্তলার বুকে মাথা লুকোলো ও।

কুন্তলা হতবিহ্বল। ডাকলো—'মা শোন। তাড়াতাড়ি এসো।'

একটু পরেই এলেন অনুরাধা দেবী। মেয়েকে বললেন—'কেন, কি হলো তোর?'

'আমার নয়, বাতাসীর।' জোর করে বাতাসীকে দাঁড় করালো কুন্তলা। বললো—'দেখো তো মা। কি যেন হয়েছে ওর। এসেই কেঁদে পড়েছে, এখনও থামেনি।'

এগিয়ে এলেন অনুরাধা দেবী। স্নেহশীতল হাত রাখলেন বাতাসীর মাথায়—'কি হয়েছে মা? কাঁদছিস্ কেন?'

কুন্তলা বলল—'কি যে হয়েছে তা বলছে না। অদ্ভুত মেয়ে যা হোক।'

বলল বাতাসী। সব বলল। ইতিবৃত্ত সবই খুলে বলল ধীরে ধীরে। মা আর মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সব।

'সত্যি, ভদ্রলোকের ঘরে এসব যে কি। ছিঃ।' অনুরাধা দেবী মুখ বিকৃত করলেন।

'এতে আর আশ্চর্য্য কি মা, ধীরেনকে আমি অনেক আগেই চিনেছি। পশুর ছেলে পশু হলেও, মানুষের সন্তান মানুষ হয়েই জন্ম নেয় না মা। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়।'

'ও ঘরের দাদাবাবুর সম্বন্ধে আর কেউ কিছু না জানুক, আমি তো জানি মা। আমাদের বস্তীর পানু, মনু, রঘু ওরা তো তার বন্ধু। রোজ

দুপুরে, রাত্রে ওরা তাস খেলে পানুদের দাওয়ায় বসে। আমি জানি, আমি জানি আর কি করে ওরা। পানুর বোন মালতী আমার সই। ও বলেছে—দাদাবাবু নাকি বলেছে ওকে'···কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল বাতাসী। এগোতে ভয় পেল—'থাক্, থাক মা আর বলব না। পারব না বলতে।',

এর বেশী শুনতেও চাইল না কুন্তলা। অনুরাধা দেবী বললেন—'থাক মা, ওসব পরের ব্যাপারে কাজ কি আমাদের?'

'তবে আমাকে কেন অমন করে গালাগালি করলেন ও ঘরের মা? আমার কি দোষ?'

'থাক মা, থাক। বাতাসীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন অনুরাধা দেবী—'ওরা যা বলে বলুক। তাতে তোর আমার কি? আজ না হয় চলে যা তুই। আমিই বাসন কটা মেজে ঘসে নেব।'

'না না, সেকি?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাতাসী—'আমিই করে দিচ্ছি মা, আপনি কেন করবেন?'

দিদিমণি, মা আর বুড়োবাবু। ছোট সংসার। খুব ছোট্ট। কয়েকটা মাত্র থালা, বাটী আর গ্লাস। নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। তবু সেদিন একটু দেরীই হল। অনেক দিনের না ধোওয়া হাঁড়িটা ঝকঝকে করতেই বেশ একটু সময় লাগছিল। অনুরাধা দেবী দিতে চাননি প্রথমে। বললেন—'থাক্, তোর মন ভালো নেই বাতাসী। ওটা আজ থাক্।' কিন্তু বাতাসী শোনেনি। জোর করে এনেছে। এ বাড়ীর কাজ করে আনন্দ আছে। নিজের খুসীতেই করার ইচ্ছে হয়।

ছাইগুঁড়ো দিয়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে দরজা ঠেলে ঢুকল কুন্তলা। এক হাত দাঁতে, অন্যহাতের তালুতে ছাইএর গুঁড়ো। শাড়ী, ব্লাউজ আর সায়া কাঁধে নিয়ে।

'দিদিমণি, আজ এত তাড়াতাড়ি যে? জল তো যায়নি এখনও।' বাতাসী চোখ তুলে তাকাল। কোণের দিকে এগিয়ে গেল কুন্তলা। কাপড়-চোপড় রাখল। কলের মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে এক গণ্ডুষ জল মুখে তুলল। কুলকুচো করে পিচকিরি ছোড়া জলের মতোঁ জল-গুলো ছুড়ে মারলো কোণের দিকে। তারপর মন দিল বাতাসীর কথায় —'কি বললি যেন?'

'এত সকালে তো স্কুল নয় তোমাদের।'

'স্কুল নয়, কলেজ বলবি।' বাতাসীর দিকে চেয়ে হাসল কুন্তলা—'জানিসনে, প্রত্যেক বুধবারই একটু আগে স্নান করি।'

'দিদিমণি, তুমি ক'টা পাশ দিলে?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে বাতাসী।

'পাশ আবার দেয় নাকি কেউ?' হাসতে হাসতে চুলের খোঁপাটা খুলে ফেলে কুন্তলা। 'কি যে বলিস তোরা, হাসি পায়। বল—ক'টা পাশ করলে?'

'বেশ, বেশ, সে যাই হোক। না হয় হলামই মুখ্যু, সে জন্যে এটুকুও জানতে পারিনে?' বাতাসী বাঁকা চোখে তাকায় কুন্তলার দিকে।

'আহা চটছিস্ কেন?' ছোট একটুকরো হাসির সঙ্গে কথা মিশিয়ে বলল কুন্তলা—'দুটো পাশ হয়ে গেছে। এবার বি, এ হবে।'

'সত্যি!' সকৌতুকে দিদিমণির দিকে তাকায় বাতাসী—'কবে? সব ঠিক হয়ে গেছে? আর পড়বে না?'

'না রে, না।' হেসে লুটোপুটি খেল কুন্তলা—'তোদের টোপর পরা বিয়ে নয়, বই-পত্রের বি, এ।

'জানিনে বাপু, সে আবার কি জিনিস। তবে এও হবে, ও-ও হবে একদিন।' হাসতে হাসতে ঝামাঘষা হাঁড়িটা কলের নীচে ধরে বাতাসী। তারপর কাজ সেরে বেরিয়ে আসে বাইরে।

পৃথিবীটা হয়তো বা অনেক বড়। পায়ে হেঁটে ফুরোনো যায় না। কিন্তু বাতাসীর জীবনে সেটা সত্য নয়। 'আনন্দময়ী ভবন' যদি বিদেশ হয় তবে 'সদানন্দ চ্যাটার্জির বস্তি' ওর দেশ। পর্বতপ্রতিম এ অট্টালিকার পাশে ছোট একটা বাইলেনকে মধ্যে রেখে কয়েক বিঘে জমি জুড়ে ঘরের অরণ্য। টালির ছাদ, আর বাঁশবেড়ায় ঘেরা ছোট ছোট আস্তানা। বাবুদের ফ্ল্যাট বাড়ীর মতোই দুটো একটা ঘর নিয়ে ছোট ছোট সংসার। এদের ঘরে বিজলী বাতি নেই, বিদ্যুৎ বাতাসও না। একমুঠো রোদের জন্যে ওরা কাড়াকাড়ি করে, ঝগড়া করে। এক নিঃশ্বাস বাতাস ওরা চুরি করে আনে বাইরের পৃথিবী থেকে। সকাল-সন্ধ্যায় ঝগড়া করে কলের জল নিয়ে। এ এক নতুন পৃথিবী, বিচিত্র পরিবেশ। এখানেই মানুষ হয়েছে বাতাসী, ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি রাত এখানেই ভোর হয়েছে ওর। 'সদানন্দ চ্যাটার্জির বস্তির' প্রতিটি ঘর ওর জানা, প্রতিটি মানুষ চেনা। মুচী দীনদয়াল, সুধাময় পোদ্দার, ডাকহরকরা ভোলাই হোক আর মালতী, শিউলী, বেলাই হোক, সকলকেই চেনে বাতাসী। সকলের সব জানে।

আর জানে 'আনন্দময়ী ভবনের' ইতিহাস।

ফ্ল্যাট নম্বর একুশ আর বাইশ।

পাশাপাশি ঘর কিন্তু কত ব্যবধান। প্রবাহমানা নদীর চিরন্তনতার মতো বয়ে চলেছে একুশ নম্বর ফ্ল্যাটের জীবন। মাদুর বিছিয়ে শুতে আর সাধারণ ভাবে থাকতেই এতদিন ধরে দেখে এসেছে বাতাসী। কোন বৈচিত্র্য নেই এদের। রদ-বদলও নেই। তবে একটু মাত্রপরিবর্তন দেখেছে ছেলেবেলায় কুন্তলাকে সেতার বাজাতে দেখেছিল ও! মাষ্টার রেখে শিখত কুন্তলা। ইদানীং সেতারের

রেওয়াজ বন্ধ হয়েছে। বাতাসী কৌতূহলী হয়ে একদিন প্রশ্নও করেছিল।

প্রশ্নটা এড়াতে চেয়েও পারেনি কুন্তলা—'এখন আর ওসব সম্ভব নয় বাতাসী। বাবার আয় তো জানিস্। শুন্‌ছি এ চাকরীঁও নাকি থাকবে না।'

সত্যি। বুড়োবাবুর জন্ম বড়ো কষ্ট হয় বাতাসীর। তবু নিজে যেটুকু পারে সে সাহায্যটুকু ও করে। স্বেচ্ছায় করে। বাজার করে দেয়, তেল-নুন টুকিটাকি কিনে এনে দেয়। সমস্ত পৃথিবীতে এখানেই যেন সত্যিকারের মানুষ খুঁজে পেয়েছে বাতাসী। মানুষ নয়, দেবতা।

আর।

ফ্ল্যাট নম্বর বাইশ।

বাতাসীর চোখের ওপরই বড়ো হয়েছে ধীরেন। আর সেই সঙ্গে উন্নতি হয়েছে ওদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার। বৈশাখের রিক্ত মাঠ আশ্বিনের শেষে যেন সোনায় সোনায় ভরে উঠেছে আজ। এই সুনীতি দেবীকেই একদিন অনুরাধা দেবীর মতো খুন্তী হাতে রান্নাঘরে দেখেছে বাতাসী। গা ভরা সোনাও ছিল না সেদিন, অলস সময় কাটানোর মত প্রচুর অবসরও ছিল না তাঁর। আজকের এই একুশ নম্বরের মতোই বাইশের ছিল জীবন। এমনি মাদুর বিছিয়ে শুয়ে শ্লথগতি দিনগুলি কোন রকমে কাটাতে চেয়েছেন ওরা। কিন্তু অকস্মাৎ, একেবারে হঠাৎই যেন পাল্টে গেল সব। সুনীতি দেবী রাজরাণী হলেন। হীরা-মুক্তা-সোনায় ভরে ফেললেন দেহ। সিল্ক আর বেনারসী-জর্জ্জেটে গা মুড়লেন। নিজে সাজলেন, ঘরও সাজালেন। মাদুর নয় আজ, জাজিম ঢাকা স্প্রীংয়ের খাট এসেছে। সুন্দর গদি মোড়া কেদারা এসেছে অনেক। কি যেন নাম ওগুলোর। বাতাসী জানে না। বাতাসী অবাক হয়েছে

দেখে। গান শোনার জন্তে রেডিও হয়েছে, গ্রামোফোন হয়েছে ওদের। আরও কত কি। আশ্চর্য্য!

বাতাসী অবাক হয়ে ভাবে—একই পৃথিবী কিন্তু এদিকে যখন রাতের অন্ধকার ওধারে তখন নাকি আলোর প্লাবন। কুন্তলার কাছে একদিন শুনেছে বাতাসী। কিন্তু কেন এমন হয়? সে প্রশ্নের উত্তর দিদিমণির মতো কলেজে পড়া মেয়েও দিতে পারেনি। এটাই নাকি সত্যি। এমনিই নাকি হবে চিরকাল।

পর পর দিনকয়েক আর বাইশ নম্বর ঘরের কাজে যায়নি বাতাসী। শুধু সেদিনের ঘটনার জন্তেই নয়। আরও অনেক কারণেই এ' বাড়ীর ওপর বাতাসীর অশ্রদ্ধা জন্মেছে আজ। দাদাবাবুর ছায়া মাড়াতেও কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে। কিন্তু সেদিন ওপরে ওঠার পথেই রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সাহেবদের মতো হ্যাট-কোট-টাই পরে অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। মুখে পাইপ। এ বাবুটিকে বেশ লাগে বাতাসীর। গতজন্মে হয়তো সাধু ছিলেন তিনি। এজন্মে তাই সঞ্চিত পূণ্যের ফলে এত সুখ তাঁর, এত ঐশ্বর্য্য। কে বলবে ধীরেন তাঁর ছেলে। সত্যি অবাক হতে হয়।

'কিরে বাতাসী!' মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে হাসলেন রজনী সোম—'কাজ বন্ধ করেছিস্ যে। রাগ করেছিস বুঝি?'

লজ্জায় মাথা নোয়াল বাতাসী। সরে দাঁড়াল।

রজনীবাবু আরও দুধাপ নামলেন—'মা কি মেয়েকে দুটো কথা বলে না? কিরে, চুপ করলি যে। বল্।'

তবু কোন কথা বলল না বাতাসী। আঁচলের কোণ দাঁতে আটকাল।

'পাগলামী করিসনে। চল্, চল্ কাজে চল্।' পাইপটা মুখে তুলে ঘুরে দাঁড়ালেন রজনীবাবু—'আয়।'

বিনা প্রতিবাদে পিছু নিল বাতাসী। কোন পুরুষের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে কোনদিন পারেনি ও। আজও পারল না। ওরা ওপরে উঠে এল। নতুন করে স্ত্রীর সঙ্গে বাতাসীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন রজনীবাবু। বললেন—'বাতাসী এসেছে। দেখো।'

সুনীতি দেবী এগিয়ে এলেন—'রাগ থেমেছে তোর?

খুসী হয়েই বুঝি বললেন রজনীবাবু—'আরও দুটো টাকা তোর মাইনে বাড়ল বাতাসী।'

বাতাসী খুসীই হল। কাজে লাগল ও। সেই কাজ। বাসন মাজা, মশলা পেশা। ঘর ঝাড় দিতে হবে না আর। সে কাজ করবে সারা-দিনের চাকর রামদীন। কাজ কমলেও মাইনে বাড়ল। সত্যি আশ্চর্য্য!

দরজা বন্ধ করে বাসন মাজছিল বাতাসী। সুনীতি দেবী ভেতরে ঢুকলেন হঠাৎ। বললেন—'মন্টু এখানে নেই, জানিস্?'

'কোথায় গেছেন?' কাজ করতে করতে প্রশ্ন করল বাতাসী। কৌতূহলী প্রশ্ন নয়। কিছু বলা প্রয়োজন বলেই বলল।

'যেমন ছেলে তেমনি আক্কেল।' ঘৃণা আর অবহেলা মিশিয়ে মুখটা বিকৃত করলেন সুনীতি দেবী—'দিয়েছি পাঠিয়ে বালিগঞ্জ। সেখানে নতুন বাড়ী হয়েছে আমাদের। গাড়ীও কিনেছি একখানা। আমরা না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই থাকবে একা। যাস্, একদিন দেখিয়ে আনব তোকে আমাদের ঘর-দোর।'

বিস্ময় বিমূঢ় চোখে তাকাল বাতাসী। বাড়ী! গাড়ী!

'বাতাসী!' দরজাটা ভেজিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এলেন সুনীতি দেবী—'সতীনাথ দাসকে তুই জানিস্?'

'কেন চিনব না মা! মালতীর বাপ। আমাদের পাশের ঘরে থাকে।'

'মালতীকে তুই চিনিস তাহলে?'

'ও আমার সই'।

'আর কিছু জানিস? এর বেশী আর কিছু?'

লজ্জায় কেঁপে উঠল বাতাসী। রক্তিম হয়ে উঠল চোখমুখ। হাতের কাজ বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল ও। আরও কাছে এগিয়ে এলেন স্থনীতি দেবী। একেবারে কাছাকাছি। আঁচলের খুঁট থেকে কড়কড়ে দশটাকার একখানা নোট বের করলেন—'দোহাই তোর বাতাসী। বলিস নে কাউকে। বল্ বলবিনে। বল্।'

'আমায় বিশ্বাস করুন মা। আমি বলব না। সত্যি বলব না। মালতী আমার সই। এক আমাকে ছাড়া আর কাউকে ও বলেনি একথা!'

'এটা রাখ্।' নোটটা এগিয়ে দিলেন স্থনীতি দেবী।

'না মা।' নিজের কাজে আবার মন দিল বাতাসী—'ওটা আমি নেব না। টাকা না নিলেও পেটের কথা পেটেই থাকবে আমার।'

না। সত্যি সত্যিই কাউকে এ'কথা বলল না বাতাসী। মেয়ে হয়েও এ'কাহিনীর একটি কথা তৃতীয়জনকে জানতে দিল না। হয়ত বলত কুন্তলাকে কিন্তু বড় ভয় হয় ওর। কুন্তলাকে ও শ্রদ্ধাই করে না, ভয়ও করে। এসব কথা শুনতে চান না দিদিমণি। এড়াতে চান। বারবার বলার চেষ্টা করেও বাতাসী তাই পারেনি বলতে। কিন্তু একথা না বললেও অনেক কথা বলার থাকে বাতাসীর। রোজই যে কোন একটি বলার মতো কথা নিয়ে ও দিদিমণির সামনে এসে দাঁড়ায়।

সেদিনও এল। বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটে সেদিন বড্ডো মজার একটা জিনিস দেখে এসেছে বাতাসী।

'আচ্ছা দিদিমণি, লোহার আলমারীর মতো ও'গুলোকে কি বলে? যার ভেতর জল, ফল, মিষ্টি সব রাখে?'

'কি বলছিস যা তা?' কি যেন লিখছিল কুন্তলা। কলমের উল্টো-দিকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল—'কোথায় দেখেছিস?'

'ও বাড়ীতে নতুন কিনেছে দেখলাম। বাইশ নম্বর ঘরে। এক গ্লাস জল খেতে দিল। উঃ, কি ঠাণ্ডা। যেন বরফগলা জল।'

'ও' হঠাৎ হেসে উঠল কুন্তলা—'রেফ্রিজারেটর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নামটা ও বাড়ীর মা বলেছিলেন বটে, কিন্তু ভুলে গেছি। ও সব ইংজিরি নাম কি আমাদের মনে থাকে ছাই।' কুন্তলার কাছে সরে এলো বাতাসী—'আচ্ছা দিদিমণি, ও'গুলোর অনেক দাম। তাই না?'

'হ্যাঁ। হাজার দুয়েক তো হবেই। বেশীও হতে পারে।'

'উঃ, ওদের কত টাকা!' বাতাসীর চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে।

'কেন, হিংসে হচ্ছে তোর?' মুচকি হেসে বাতাসীর দিকে তাকায় কুন্তলা।

'ছিঃ, হিংসে করব কেন? আমরা ছোটজাত, ছোটমানুষ। তোমাদের হিংসে করতে পারি কখনও?'

'আমাদের কি তোদের চাইতে বড়ো মনে করিস নাকি? চারতলায় থাকলেই বড় হয় না বাতাসী, ভেতরের খবর জানিস? বেশ, বলতো তোর কটা শাড়ী?'

'দুটো।'

আমারও দুটোই।' কুন্তলা হাসল—'এক রোববারে একটা ধুয়ে ইস্তিরি করি, কলেজে যাই আর পরের রোববারে অন্যটা ধুয়ে নিই।

দেখছিস না বাসায় কি পরি।' পায়ের কাছে পাড় ছিঁড়ে যাওয়া কিছুটা অংশ বাতাসীকে দেখাল কুন্তলা।

'সত্যি দিদিমণি, তোমাদের খুব কষ্ট। তাই না?' সমবেদনায় বাতাসীর কণ্ঠস্বর যেন করুণ হয়ে আসে—'কষ্ট হয় বুড়োবাবুর জন্যে। এত খাটুনি সহ্য হয় এই বুড়ো বয়সে?'

'তোর হয়, আমার হয় না?' খাতাটা বন্ধ করে কুন্তলা। কলমের ক্লীপ আটকে উঠে বসে—'এই ষাট বছর বয়সেও বাবাকে এত কষ্ট সইতে হচ্ছে, আমার মতো এতো বড়ো মেয়ে ঘাড়ে থাকতেও মাকে হেঁসেলে কাটাতে হয় সারাদিন। কিন্তু কি করব বল্। একেবারে সময় নেই আমার। টেষ্ট পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। মাত্র মাস তিনেক। জানিস বাতাসী, পরীক্ষা যদি দিতে পারি আর পড়ব না ভাবছি। চাকরী করব। এই বুড়ো বয়সে বাবাকে কত আর কষ্ট দেব, বল্।'

'কিন্তু'—দিদিমণির দিকে দুই চোখে তাকাল বাতাসী—'কিন্তু তোমাকে চাকরী করতে দেবেন বুড়োবাবু?'

'কেন দেবেন না!' হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল কুন্তলা—'তুই বুঝি অন্য কথা ভাবছিস্?'

বাতাসীও হেসে ফেলে—'কি আবার ভাববো?'

'না রে বাতাসী, যা ভাবছিস তা আর হবে না? হতে পারেনা, কি করে হবে বল্? আমি যদি দূরে চলে যাই তবে এ বুড়ো মাকে, বাবাকে কে দেখবে বল্। কি করে এদের চলবে বলতো?'

'সত্যি দিদিমণি, তুমি যদি ছেলে হয়ে জন্মাতে—'

'তাতে কি।' বাতাসীর কথা ছিনিয়ে নিলো কুন্তলা—মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে যে কোন অপরাধ করিনি সেটাই তো প্রমাণ করতে চাই।'

দিদিমণির চোখের দিকে তাকাতে পারেনা বাতাসী। মনটা ককিয়ে ওঠে ওর। বুঝিবা চোখের জলও ছলছলিয়ে ওঠে।

'জানিস বাতাসী, বড় বেশী আশা করেছিলাম নিজের সম্বন্ধে। বি, এ-ই শুধু নয়, আরও অনেক পড়ব। বিয়ে যদি করতেই হয় তবে সত্যিকারের পুরুষ দেখে বিয়ে করব। পড়াশুনোর পরেও আমার অনেক কিছু করার ইচ্ছে আছে বাতাসী। কিন্তু এখন মনে হয় সে সব নেহাৎই স্বপ্ন।' আর কিছু বলতে পারেনা কুন্তলা। চোখের জলে সব দুর্বলতা বুঝি ধরা পড়ে যাবে। বই-খাতা গুটিয়ে উঠে পড়ে ও।

শঙ্খচূড়ের ছোবল পড়ল গায়ে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সব। আশা, স্বপ্ন, কল্পনা।

কয়েকদিন পরে বাতাসী অবাক হল দেখে। একুশ নম্বর ফ্ল্যাটে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব, থমথমে চারদিক। রান্নাঘরের দরজা খোলা অথচ উনুনে আগুন পড়েনি এখনও। এঁটো বাসনগুলো ছড়িয়ে আছে রোজকার মতো। বাতাসী থামল। এগিয়ে এসে শোবার ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল। ভেজানো দরজাটা ঠেলে ধীরে ধীরে ঢুকল ভেতরে। গতরাতের বিছানা তোলা হয়নি তখনও। শুয়ে আছেন দিদিমণি।

চুল ছড়িয়ে বসে আছেন অনুরাধা দেবী। এককোণে বুড়োবাবু পা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। সবাই যেন কেমন ভীত, চিন্তিত মনে হল। বাতাসীর হঠাৎ আবির্ভাবে ত্রস্ত হলেন সবাই। নড়েচড়ে বসলেন।

বাতাসী ডাকল—'মা।'

'আয় মা।' অনুরাধা দেবী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন—'শোন বাতাসী, একটা কথা বলব তোকে বাইরে আয়।'

বাতাসীর হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন অনুরাধা দেবী—'সেই ছোটবেলা থেকে তো আমরা দেখে আসছি তোকে। যদি কোনদিন কোন কটু কথা বলে থাকি কিছু মনে করিসনে মা। মেয়েকে মা কি কিছু বলে না ?'

অবাক হয়ে তাকাল বাতাসী—'হঠাৎ এসব কথা কেন মা ?'

'আর তো তোকে আমরা রাখতে পারবো না বাছা ! তোর বাবুকে কাল অফিস থেকে জবাব দিয়েছে। তুই তো আমাদের সংসারের খবর সব জানিস বাতাসী।' বলতে বলতে অনুরাধা দেবীর চোখে জল এসে যায়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন—'এই বুড়ো বয়সে আবার কোথায় যে চাকরী পাবেন। যতদিন না পান ততদিনই যে কি করে চলবে সেটাই ভাবছি।'

দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে দাঁড়িয়ে থাকে বাতাসী। অনুরাধা দেবীর পায়ের ওপর চোখের দৃষ্টি আছড়ে পড়ে ওর।

কিছুক্ষণের প্রশান্তি।

'বাতাসী।' বাতাসীর মাথায় হাত রাখলেন অনুরাধা দেবী—'দুঃখ করিসনে মা। সকলের দিনই কি সমান যায় রে ?'

হঠাৎ বাতাসীর দু'চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ে। অনুরাধা দেবীর পা জড়িয়ে ও চীৎকার করে ওঠে—'না মা, আমি কিছু চাইনে। কিচ্ছু না। আপনাদের কাজ আমি এমনি করে দেব। আপনি আমার মা। আমি ছাড়ব না আপনাদের। কিছুতেই না।' বাতাসীকে দাঁড় করানো হ'ল। অনুরাধা দেবী নন, কুন্তলা এসে বাতাসীকে তুলল ধীরে ধীরে—'ছিঃ বাতাসী, ছেলেমানুষী করিসনে। ওঠ।'

বাতাসী দাঁড়াল ; ঠোঁট কাঁপছে, গলা কাঁপছে ওর।

'যে কাজটা তোর করতে হয় সেটা কি আমি করতে পারবো না

বাতাসী, খুব পারব।' বাতাসীর বাঁ হাত নিজের বুকে টেনে নেয় কুন্তলা।

'তিন মাস বাদে তোমার না পরীক্ষা দিদিমণি।' বাতাসী চোখ তুলে তাকায়।

'এ'বছোর তো আর দেব না। যদি কোনদিন সময় হয় দেব। ভালো একটা স্কুল মাষ্টারী পাওয়ার কথা আছে। যদি পাই তবে সেটাই করব আপাতত।'

'সত্যি তুমি আর পড়বে না দিদিমণি?' বাতাসী অবাক হয়ে তাকায়।

'কি করে আর পড়বে বল্?' অনুরাধা দেবী আবার চোখ মুছলেন—'মাথা নিয়ে জন্মালেই তো আর সকলের পড়াশুনো হয় না বাতাসী। পয়সা চাই।'

'থাক মা, ওসব কথা বলে আর লাভ কি অনর্থক। ওঘরে বাবা আছেন শুনলে আবার ব্যথা পাবেন।' মায়ের কথায় বাধা দিলো কুন্তলা—'তাহলে তুই যা বাতাসী। মাঝে মাঝে আসিস্।'

'মাঝে মাঝে নয়, কাজ সেরে যাবার সময় রোজই একবার দেখা করে যাস্।' অনুরাধা দেবী মেয়ের কথা শুধরে দিলেন।

'তাহলে সত্যি আপনারা আমায় ছাড়িয়ে দিচ্ছেন মা।' ছলোছলো চোখে মা দিদিমণির দিকে তাকাল বাতাসী।

'কি করব। উপায় নেই।' অনুরাধা দেবীর কথায় করুণ সুর।

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাতাসী। তারপর ধীরে ধীরে, পা গুণে গুণে একুশ নম্বর ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে হল, প্রয়োজন নেই এ কাজ করার। 'আনন্দময়ী ভবন'ই ছেড়ে দেবে বাতাসী।

কাজে আর মন নেই বাতাসীর। 'আনন্দময়ী ভবন'কে আজ যেন বড়ো ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। জীবনে আজ যেন এই প্রথম নিজের সংজ্ঞা খুঁজে পেলো বাতাসী, ও ঝি। কতো ছোট, কতো নীচু তলায় ওর ঠাঁই।

এতদিন তবু এ' জীবনের একটা দাম ছিলো; বুক উজাড় করে কাঁদবার স্থান ছিলো একটা। আজ সব ফুরিয়েছে। তবু ওকে কাজে আসতে হয়। মাসের শেষে যদি বাবার হাতে দু'মুঠো টাকা তুলে দিতে না পারে তার রক্ষে নেই। পিঠের চামড়াই বুঝি থাকবে না আর। বাতাসীর মনে আছে—ওরই সামনে মাকে কতো মার খেতে হয়েছে। কারখানার মানুষ বাবা। রাগটাও তেমনি। তাই কাজে আসতে হয় ওকে। নইলে এ'চাকরী ছাড়তে পারলে মুক্তিই পেতো ও।

সেদিন ওপরে ওঠার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বাতাসী। বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে চার চারটে পুলিস। ওদের হাতে বন্দুকও আছে। প্রথমে একটু ভয় পেল বাতাসী কিন্তু কাছে এসে দাঁড়াতেই পুলিসগুলো সরে দাঁড়ালো। পথ করে দিল। ভেতরে ঢুকে বাতাসী আরও অবাক হল। ডানদিকে শোবার ঘরে একজন দারোগাকে কি যেন বোঝাচ্ছেন রজনীবাবু। বিস্তর কাগজ-পত্তর টেবিলে ছড়ানো। প্লেট ভরা মিষ্টি আর চা। বাতাসী ভয় পেল। ধীরে ধীরে সুনীতি দেবীর সামনে এসে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে ডাকল—'কি হয়েছে মা? পুলিস কেন?'

বালিসে মুখ লুকিয়ে শুয়ে ছিলেন সুনীতি দেবী। কাঁদছিলেন। বাতাসীর ডাকে মাথা তুলে বললেন—'এখন তুই যা বাতাসী। পরে আসিস, সব বলব। যা।' তারপরই আবার বালিসে মাথা গুঁজলেন। আর ফেরালেন না। কিছুই বুঝল না বাতাসী। কাজ করতেও কেমন যেন ভয় করল। লঘুপায়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

কি করেই বা জানবে ও—কি ব্যাপার, কেন পুলিস? তাই বহুদিনের অভ্যাস মতোই একুশ নম্বর ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল বাতাসী। ওর সব প্রশ্নের উত্তর যেখানে মেলে। বাইরে কেউ নেই, রান্নাঘর ফাঁকা। উনুনে ভাত ফুটছে প্রাত্যহিক নিয়মে।

কাউকেই ডাকল না বাতাসী। এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। দরজার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। কি যেন বলছেন বুড়োবাবু। কান পাতল বাতাসী, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইল।

'এমনিই হয়, বুঝলি কুন্তলা।' বুড়োবাবু বলছেন—'এমনি এক রজনীবাবু কেন, হাজার বাবু আছে এ' দেশে। একটি পয়সার লোভ যেখানে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, সেখানে আবার মনুষ্যত্ব কি? বাঘ একবার যদি রক্তের গন্ধ পায় তবে কি সে শান্ত থাকতে পারে? তখন সে বেপরোয়া। অনেক আগেই আমি বুঝেছিলাম, সামান্য অফিসার হয়ে দিন দিন এমন অর্থশালী হচ্ছেন কি করে রজনীবাবু। মাইনের টাকায় সংসার চালিয়ে যদিও বা বেশী কিছু থাকে তবে সে টাকায় সোফা-কৌচ হয় না।'

'শুনলাম বাড়ী আর গাড়ীও নাকি করেছে বালিগঞ্জে।'

'বাড়ী গাড়ী কেন? আরও কত হতো।' বুড়োবাবু হাসলেন।

'আচ্ছা বাবা, লোকে ওদের প্রশ্রয় দেয় কেন? মানুষ যদি ঘুষ না দেয় তবে তো ওরা এত অন্যায় করবে না।' দিদিমণির সেই শান্ত গলা।

'তোরা ছেলেমানুষ, সে'সব বুঝবিনে।' বুড়োবাবু মুখের হাসিটা টানলেন—'কেন ঘুষ দেয়!' মানুষ কি আর সখ করে দেয় রে—প্রয়োজন বলেই দিতে হয়। কেন, আমি দিইনি? এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার সময় আমায় সেলামী দিতে হয়নি? সেটাও তো ঘুষ। যদি

না দিতাম তবে তোদের নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠতাম, বল্। তাই বাধ্য হয়েই দিয়েছি। তবে আমি দিয়েছি দুশো আর ওরা এক কিস্তিতে ঘুষ নেয় হাজার, দু'হাজার।'

'ছিঃ।' দিদিমণি বুঝি ভ্রূ কুঞ্চিত করেন।

'তোমরা যাই বলো আমার কিন্তু কষ্ট হচ্ছে ওদের জন্যে। হাজার হোক, পুলিশের-হামলা তো।' অনুরাধা দেবী বললেন।

'রজনীবাবু যে অপরাধ করেছেন তার তদন্ত করতে এসে পুলিস কি বেশী অন্যায় করেছে বলতে চাও?'

'থাক, তোমাদের সঙ্গে এ' নিয়ে তর্ক করে আর লাভ নেই। কুন্তলা যা তো মা, বাসন কটা মেজে রেখে আয়।, অনুরাধা দেবী দরজা কাছে এগিয়ে আসছেন মনে হল যেন।

বাতাসীর সমস্ত শরীর এতক্ষণ রি রি করছিল। ঘৃণায়, অশ্রদ্ধায়। এই রজনীবাবু? ধীরেন দাদাবাবুরই দোষ নয় শুধু, দোষ রজনীবাবুরও। গাছের একটা আম টক হলে, কোন আমই মিষ্টি নয়।

বুড়োবাবু আর দিদিমণি তখনও যেন কি সব বলাবলি করছিলেন। অনুরাধা দেবীর পায়ের শব্দ শুনেই পিছিয়ে এল বাতাসী। নিঃশব্দ পদক্ষেপে দ্রুত বেরিয়ে এল।

আবার বাইশ নম্বর ফ্ল্যাট। আবার পুলিস। বাতাসী এগিয়ে যেতেই সিপাহীরা পথ করে দিল। বাবুর দিকে, মায়ের দিকে তাকাল না বাতাসী। একেবারে রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

ছিঃ ছিঃ, এরাই নাকি ভদ্দরলোক। এত টাকা, এত বাসন, আসবাব সব এসেছে কোত্থেকে, জানে বাতাসী। আগে ভেবেছিল রজনীবাবুর পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফল, আজ বুঝেছে এজন্মেরই পাপপ্রসূত এ'সব।

বেশ কিছুদিন পরে। হঠাৎ একদিন বাতাসীকে শুনতে হল—'আমরা আর এখানে থাকব না রে।'

বাতাসী তাকাল গিন্নীমার মুখের দিকে—'চলে যাবেন ?'

'হ্যা।' সুনীতি দেবী উল বুনতে বুনতে বললেন—'কি করব .বল। তোর বাবুর তো আর চাকরী নেই, ছেলেটাও একা পড়ে আছে। তাই ভাবছি নিজের ঘরে গিয়েই থাকব।

'বাবুর চাকরী নেই!' বাতাসীর চোখজোড়া জলে উঠল হঠাৎ—'কেন মা, জবাব দিয়েছে বুঝি ?'

'চুপ!, প্রায় গর্জে উঠলেন সুনীতি দেবী—'উনি কি কেরানী নাকি যে জবাব দেবে কথায় কথায় ? চাকরী করতে আর ভালো লাগছে না তাই ব্যবসা করবেন।'

বাতাসী চুপ করে। হয়তো তাই। বড়বাবুরাই তো জবাব দেন, ওঁদের আবার জবাব দেবে কে ? নিঃশব্দে চলে যায় বাতাসী।

'দিদিমণি।'

'আরে বাতাসী যে। আয়, বোস।' স্নান করতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল কুন্তলা। বাতাসীকে হেসে অভ্যর্থনা করল।

'এত তাড়াতাড়ি স্নানে যাচ্ছো যে। আবার লেখাপড়া সুরু করেছ বুঝি।'

'না রে না। একটা সুসংবাদ দেব, কি দিবি বল্।'

'কি গো দিদিমণি ?' আগ্রহে আকুল হয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় বাতাসী।

'চাকরী পেয়েছি।' কুন্তলা হাসল—'এবার আর মাষ্টারের কাছে পড়া নয়, মেয়েদের পড়াতে হবে।'

'সত্যি।' বাতাসীর চোখে খুসীর উজ্জ্বলতা—'আমিও একটা খবর দেব।'

'কি?'

'বাইশ নম্বর ঘরের বাবুর চাকরী নেই।'

'তাই নাকি?' কুন্তলা ডান হাতের আঙুল দিয়ে ছাই তুলল বাঁহাত থেকে। অফিস থেকে বরখাস্ত করেছে বুঝি। জানতাম, এমনি একটা কিছু হবে।'

'না না, বরখাস্ত নয়।' বাতাসী জিভ কাটে—উনিই ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছেন। উনি যে সাহেবমানুষ, ওঁকে কে জবাব দেবে?'

দাঁত ঘষতে ঘষতে হাসল কুন্তলা—'তোকে এই বলেছে বুঝি? না রে, সাহেব হলেই বড়বাবু হয় না। তাঁদের জবাব দেবার মতো বড়বাবুও আছে।'

'কি জানি, অতোসতো বুঝিনে বাপু।' বাতাসী ঠোঁট ওল্টাল।

'যা, রান্নাঘরে মার সঙ্গে কথা বল্। আমি আসছি।' স্নানঘরের দরজা বন্ধ করল কুন্তলা।

রান্না করছিলেন অনুরাধা দেবী। দরজার কোণে এসে দাঁড়াতেই তাকালেন বাতাসীর দিকে—'এই যে মা। কি খবর? এসেছিস ভালোই করেছিস। অনেক দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'ভালো আছেন!'

'হ্যাঁ, ভালো।' উনুনের ওপর কড়াইটা বসালেন অনুরাধা দেবী—'তুই তো ভুলেই গেছিস আমাদের। আসিসনে কেন?'

লজ্জায় মাথা নোয়াল বাতাসী—'না মা, অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন।'

'আরে, আচ্ছা পাগলী তো তুই।' একগাল শুকনো হাসি হাসলেন

অনুরাধা দেবী—'তারপর, তোর খবর বল্। কাজকর্ম্ম ভালো চলছে তো।

'না মা, আরও একটা ঘর কমে গেল।'

'কোন্ ঘর?' উদগ্রীব হয়ে তাকান অনুরাধা দেবী।

'বাইশ নম্বর।' বাতাসী বলল—'ওরা চলে যাচ্ছে ওদের নিজেদের বাড়ী। বালিগঞ্জ না কোথায় যেন।'

'ওঃ।' ছোট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন অনুরাধা দেবী—'আমরাও আর এখানে থাকব না বাতাসী। চলে যাব।'

'চলে যাবেন?' সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে বাতাসীর—'কোথায় যাবেন মা?'

'সে তো ঠিক নেই মা। তবে এখানে থাকা সম্ভব নয়। তোর বাবু এখনও কোন কাজ পাননি। কুন্তলার জন্তেই টিকে আছে সংসারটা। এত টাকা ভাড়া দিয়ে কি আমরা থাকতে পারি? 'হাত ধুয়ে কাছে দাঁড়ালেন অনুরাধা দেবী।—'বাতাসী, আমাদের জন্তে একটা কাজ করে দিবি?'

'দেব মা, নিশ্চয়ই দেব। বলুন।'

'তোদের ওখানে খালি ঘর আছে? খোঁজ করে দেখ না আমাদের জন্তে।'

'আমাদের ওখানে যাবেন কি মা? ও যে বস্তী।'

'হোক্। সেখানে তোরা যদি থাকতে পারিস্ তবে আমরা পারব না?' বাতাসীর মাথায় হাত রাখলেন অনুরাধা দেবী—'না মা, এ কাজটা তোকে করতেই হবে। জানিস তো, আজকাল দালান কোঠার ভাড়া কত বেশী। তাই সেদিন তোর বুড়োবাবু বলছিলেন—বাতাসীকে বলো, ও নিশ্চয়ই করবে আমাদের জন্তে।' বাতাসীর

চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন অনুরাধা দেবী—'এ কাজটা যদি করতে পারিস্ তবে বুঝব মেয়ে হয়ে মায়ের জন্যে করলি কিছু।'

কিছুক্ষণ মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইল বাতাসী।

'কিরে, চুপ করে রইলি যে। বল্।'

'আচ্ছা মা, দেখব চেষ্টা করে।' আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল বাতাসী। বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে।

উদয়াস্ত খাটুনির শেষে ক্লান্তি আর অবসাদে নুয়ে পড়া দেহ নিয়ে ঘরে ফেরে শুকদেব। ফ্যাক্টরী ছুটি হয় পাঁচটায়, ঘরে ফিরতে ছ'টা বাজে রোজ। তারপরই হুঁকো নিয়ে বসে ঘরের দাওয়ায়। মনের সুখে সুখটান টানে। বুক জুড়োয়। কোন কোন দিন সত্যেন দাসের ঘরে গিয়ে তাসের আড্ডায় বসে।

'বাবা।' সেদিন সন্ধ্যায় বাতাসী সামনে এসে দাঁড়াল—'একুশ নম্বর ফ্ল্যাটের বাবুদের কথা যে বলেছিলাম মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব। ওই যে খুব ভাল লোক যারা?' কল্কের আগুনে দুবার ফুঁ দিয়ে আবার হুঁকোটা মুখে তুলল শুকদেব।

'হ্যাঁ, ওরা আমাদের বস্তীতে আসতে চায়।'

'বাঃ বাঃ।' হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠে শুকদেব—'কেন রে বাতাসী, তোর বাবুদের বাবুগিরি ভেঙ্গে গেল? শালা এক বাবু কেন, সব বাবু নামবে। বুঝলি বাতাসী, যার শালা দুটি টাকা আছে, সেই বাবু, আর যার নেই সেই—'

'বাবা।' শুকদেবকে ধমক দেয় বাতাসী—'ওভাবে কথা বলবে না

তুমি। ও বাড়ীর দিদিমণি মাষ্টারী করে, বুড়োবাবু, মা তাঁরা সবাই ভদ্দরলোক।'

'রাখ, রাখ তোর ভদ্দরতা। সব শালাকেই চিনেছি।' আপন মনেই গর্জাতে থাকে শুকদেব—'তা তোর বাবুদের জন্তে কি করতে হবে আমায়?'

'আমাদের এ' বেড়ার ঘরে বাবুদের কি করে আনি বলো।' ওধারের টিনের ঘরগুলো তবু আমাদের চাইতে অনেক ভালো, অবশ্য ভাড়াটাও তেমনি। তা হোক, ফ্ল্যাট বাড়ীর চাইতে নিশ্চয়ই অনেক কম।' বাতাসী বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর হয়ে বলল—'শোন বাবা, সাত নম্বর ঘরের নীলাম্বর মিস্তির খুব শীগগিরই চলে যাবে শুনেছি। দেখবে ওটা যেন হাতছাড়া না হয়।'

নির্বিকারমনে হুঁকোয় আরও দুটো টান দিয়ে বলল শুকদেব—'নিশ্চয়ই দেখব। আলবৎ দেখব। তোর ওই বুড়োবাবুর সঙ্গে দাবা খেলব আমি, আর তুই তোর দিদিমণির সঙ্গে লুডো খেল্‌বি, দাওয়ায় বসে বাঘ-বন্দী খেল্‌বি। বস্তীর আর সবাই হিংসে করবে আমাদের দেখে। কেমন মজা হ'বে বলতো।'

'ছিঃ, ওরা যে বাবুমানুষ বাবা'

'রাখ, রাখ। হুঁকোটায় আরও কয়েকবার টান টেনে বলল শুকদেব—'এখানে এসেও তোর বাবু কি বাবু থাকবে ভেবেছিস্। এখানে থাকলে আমাদেরই মতো থাকতে হবে, আমাদের ঘেন্না করলে চলবে কেন?'

আর কথা বাড়াতে চাইল না বাতাসী। বিরক্ত হয়ে বলল—'হবে, হবে, সব হবে। আগে যাও, ঘরটার খোঁজ নিয়ে এসো।'

'এই তো যাচ্ছি মা।' শেষ টান টেনে মেয়ের হাতে হুকোটা ফিরিয়ে দিল শুকদেব, বলল—'তোকে আমি হলপ্‌ করে বলছি বাতাসী,

নীলাম্বর যদি সত্যি ঘর ছাড়ে, তবে আমি কথা নিয়েই ফিরব। বায়না করব কাল সকালে।'

খুসী হল বাতাসী। পরে আরও খুসী হল, যখন সত্যি সত্যি সুসংবাদ নিয়ে ঘরে ফিরল শুকদেব।

সমস্ত পাড়াকে সচকিত করে একদিন দুটো লরী এসে দাঁড়াল 'আনন্দময়ী ভবনের' সামনে। অবাক হয়ে দেখল সবাই। সেইসব দামী আসবাবপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন বাইশ নম্বরের রজনী ঘোষ। 'আনন্দময়ী ভবনের' রেলিংএ রেলিংএ ঝুঁকে পড়েছে মানুষ। বিস্ময় উপচে পড়ছে সকলের চোখে।

লরী দুটো চলে গেল। পড়ে রইল হলুদ রংয়ের মস্ত একটা গাড়ী।

বাতাসী অবাক হয়ে দেখল—এ গাড়ী মাল বইবে না। বাবু আর মা গিয়ে ঢুকলেন। এতগুলো মানুষের চোখে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল এ গাড়ীটাও। চোখের কোণে যেন জলের অস্তিত্ব বুঝতে পারল বাতাসী। মুছল।

'সদানন্দ চ্যাটার্জ্জির বস্তির' একেবারে কোণের দিকে, নীলাম্বর মিত্রের পরিত্যক্ত ঘরে তখন কান্নার রোল পড়ে গেছে। মৃতের শোক নয়, যুদ্ধেও যায়নি ওদের বাড়ীর কেউ, তবু কাঁদছে ওরা; কেন কাঁদে, তা কেউ জানেনা, শুধু বাতাসীই জানে।

অবাক হয়ে দেখে বাতাসী। ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে 'আনন্দময়ী ভবন'। চুণ-সুরকী ঢাকা প্রতিটি ইঁট যেন খসে খসে পড়ছে। ফ্ল্যাট নম্বর একুশ আর বাইশ কেন শুধু, হয়তো বা প্রতি ঘরেই চলছে এ ভাঙ্গা-গড়ার খেলা!

বাতাসীর চোখে জল। বিশাল বিশ্বকে চেনেনা বাতাসী। জানেনা। নইলে বুঝত—

ভাঙছে, ভাঙছে, গড়ছেও।

ভাঙছে দেশ আর মহাদেশ। গড়ছে দ্বীপ।

সমস্ত 'আনন্দময়ী ভবনই' ভেঙে পড়বে একদিন। গলিত মোমের মত মিশে যাবে মাটীতে।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজে গিয়েও ফিরে এল বাতাসী!

না, এখানে আর নয়। এখানে মানুষ নেই।

ছোট ভাই মন্টু। বোনটা আরও ছোট—লতা।

'তোর কি হয়েছে রে দিদি। রাগ করেছিস বুঝি?' ঝুপ করে ঝর্ণার কোলের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মন্টু।

'কই, না তো। কিছু তো হয় নি আমার।' জোর করে হাসবার চেষ্টা করলো ঝর্ণা। ভাইকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিলো।

'তবে অমন করে বসে আছিস কেন?'

'মন্টুটা যে কি।' ঘরের কোণে পুতুলের সংসার নিয়ে ব্যস্ত ছিলো লতা। হঠাৎ মুখ খুললো—'বড্ডো বোকা তো তুই মন্টু। জানিস নে, দিদির বিয়ে হবে শিগগির। মার মতো বউ হবে, ঘোমটা দেবে, সিঁদুর পরবে। না রে দিদি?' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলো লতা, সেলুলয়েডের পুতুলের গায়ে ছেঁড়া শাড়ীর পাড় জড়াতে জড়াতে।

'সত্যি দিদি, তুই আমাদের মা হয়ে যাবি।' চিন্তিত মুখে ছোট হাতখানা ঝর্ণার গালে রাখলো মন্টু।

'ধ্যেৎ।' বড়ো দুঃখেও বুক ফেটে হাসি বেরিয়ে এলো ঝর্ণার—'ওসব বলে না মন্টু। পাপ হয়।'

'সত্যি দিদি, এতটুকু যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকতো মন্টুটার। দাদা না ঘেঁচু।' পুতুল ফেলে উঠে এল লতা। দু হাত নেড়ে ভারিক্কীস্বরে বোঝাতে সুরু করলো—'আরে, বিয়ে হলেই আমাদের মা হবে কেন?

আমাদের জামাইবাবুর বউ হবে। আজ তাই দিদিকে দেখতে আসবে। কতলোক আসবে দেখিস।'

'লতা।' ছুটে গিয়ে ছোট বোনের বব্‌ছাট চুল চেপে ধরে ঝর্ণা। সজোরে একটা চড় কষিয়ে দেয় গালে—'বেশী ডেঁপো হয়েছিস না? যা বেরো।' একটা ধাক্কা মেরে কিছুদূরে ওকে সরিয়ে দিলো ঝর্ণা।

মিথ্যে কথা বলা পাপ কিন্তু এমন সত্য কথা বলায় যে কি দোষ থাকতে পারে তা ভেবে পেল না লতা। অথচ প্রতিবাদ করার মতো ভাষা বা সাহসও নেই ওর। উপায়ন্তর না দেখে কেঁদেই ফেললো হঠাৎ। বেরিয়ে গেলো কাঁদতে কাঁদতে। হয়ত মার কাছে নালিশ জানাতে।

লতা বেরিয়ে গেলে ভাইকে আবার বুকে টানলো ঝর্ণা। খাটের ওপর বসলো।

'ওকে মারলি কেন রে দিদি।'

'এমনি।' ছোট ভাইয়ের নরমচুলে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করলো ঝর্ণা—'আচ্ছা মন্টু, আমি চলে গেলে খুব কষ্ট হবে তোর? কাঁদবি?'

'বারে, চলে যাবে কেন? কোথায় যাবে?'

এবারে নীরব হতে হয়। কোথায় যাবে? সে কি ঝর্ণা নিজেই জানে ছাই।

'বলনা দিদি, কোথায় যাবি?' মন্টুর আবদার—'আমায় নিবি তোর সঙ্গে। সেই সেবারে যেমন মামাবাড়ী গিয়েছিলাম আমরা সবাই।'

'এতো আর মামাবাড়ী নয়।' মন্টুর গালে আদর ক'রতে ক'রতে বললো ঝর্ণা। মনে মনে হাসলো।

'তবে।'

এবারে একফোঁটা শিশুর কাছেই লজ্জা পেলো ঝর্ণা। মন কুঞ্চিত হলো। কি ক'রে বোঝাবে ওকে, কোথায় যাবে ও। কোন বাড়ী। ভাইয়ের কপালে ছোট একটা চুমু এঁকে বললো—'থাক মণ্টু, স্নান করো। স্কুলে যাবে না?'

স্কুল! ঝর্ণা নিজেই যেন চমকে উঠলো শব্দটা শুনে। 'হাফ ইয়ার্লী' পরীক্ষা কবে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো খাতা দেবারও সময় হয়েছে এখন। আজ কি কাস দেবে। ইতিহাসের নম্বর অবশ্য ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে ও—ফার্ষ্ট। ফার্ষ্ট গার্ল শিপ্রার চেয়ে দু' নম্বর বেশী, অঙ্কে চৌষট্টি, শিপ্রার চেয়ে পাঁচ নম্বর কম। তা হোক, সব মিলিয়ে শিপ্রাকে পেছনে রাখতে পারলে তো কথাই নেই কোন। সে এক চরম আত্মপ্রসাদ।

মণ্টুর হাত ধরে নিজেও উঠে দাঁড়ালো ঝর্ণা। কোণের আলনা থেকে শাড়ী, ব্লাউজ আর সায়া টেনে নিলো। মণ্টুর জন্যে একটা প্যাণ্ট। সাবান আর গামছাটাও। তারপর পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে। তেল আছে বাথরুমে।

'কোথায় যাচ্ছিস।' রান্নাঘরে ছিলেন মা। প্রশ্ন করলেন।

'স্নান করতে।' নরম গলায় বললো ঝর্ণা।

'মণ্টু আর লতাকে স্নান করিয়ে দে। তুই পরে করিস।'

আঘাত পেলো ঝর্ণা। হিম হয়ে গেলো সারা শরীর। এ আশঙ্কা অনেক আগেই করেছিলো ও। আজকে কেউ ওকে যেতে দেবে না স্কুলে। বাধা দেবে। কিন্তু ওকে যে যেতেই হবে। হয়তো নতুন কোন খাতা দেবে আজ।

'মা।' রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো ঝর্ণা। মিনতি জানালো, অনুরোধ—'আমার একটু দরকার আছে মা। যাই।'

'না।' উনুনটা কাদামাটি দিয়ে নিকোতে নিকোতে বললেন শান্তি দেবী—'অফিসে যাবার আগে উনি আমায় বারণ করে গেছেন। যাসনে। ফিরে এসে তোকে যদি দেখতে না পান তবে ভীষণ রাগ করবেন।'

'বাবা আসবার আগেই আমি ফিরে আসব মা।'

'উনি একটু তাড়াতাড়িই ফিরবেন আজ। ছুটি নেবেন অফিস থেকে।'

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঝর্ণা। নখ খুঁটলো দাঁতে- 'আমিও বারটার আগেই ফিরব মা।'

'হচ্ছে কি এসব?' হাতের কাজ বন্ধ রেখে উগ্র হয়ে উঠলেন শান্তি দেবী। বিরক্ত হলেন—'এত যে মানা করছি কানে যাচ্ছে না? নিজের জেদটাই যদি রাখবি তবে আবার জিজ্ঞেস করতে এসেছিস কেন? যা না, যা।'

এরপরে আর কথা বাড়ালো না ঝর্ণা। ঘরে ফিরে এলো শান্ত পায়ে। সমস্ত বুক উজাড় করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর। মনে হচ্ছে চীৎকার করে কাঁদতে পারলেই বুঝি স্বস্তি পেত ও। শান্তি পেত। সায়া, ব্লাউজ, শাড়ী খাটের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে পড়লো ও। গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। কান্নায় কান্নায় ও মরে যেতে চায় আজ। তবেই হয়তো এ নিশ্চিত আহুতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

অনেক কেঁদেছে ঝর্ণা। চোখের জলে উজাড় করেছে বুক। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ এগিয়ে আসেনি। সমবেদনা নয়, সান্ত্বনা নয়, পিঠেও হাত রাখেনি কেউ কোনদিন। ওর হৃদয়কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো একজন মানুষও নেই পৃথিবীতে। যাকে আশ্রয় করেও অন্ততঃ

এ সঙ্কট থেকে বাঁচাতে পারে নিজেকে। প্রাণ পেতে পারে। শীতের শিশিরে ভেজা নেতানো লতা যেমন প্রভাতী রোদের ছোঁওয়ায় সজীব হয়ে ওঠে। ঝলমলায়।

আজ নেই অথচ এক বছোর আগেও ছিলেন একজন।

সুবোধদা পিসতুতো ভাই ওর। উত্তর তিরিশ দীর্ঘাঙ্গী পুরুষ। বইয়ের পোকা। অধ্যাপনার কাজ ছাড়াও যেটুকু সময় হাতে থাকতো তাঁর সেটুকু সময়ও তাঁকে ঘরে বসে বইয়ের অক্ষর গুণতেই দেখেছে ঝর্ণা। বেশ মানুষ। আজও মনে আছে—মাঝে মাঝে এসে ওকে পড়িয়ে যেতেন। পড়ানোর ছলে আজব পৃথিবীর অনেক বিচিত্র খবর শুনিয়ে যেতেন রোজ। বলতেন—'আত্মসমৃদ্ধির জন্যে পড়াশুনোই যদি না করতে পারিস্ তবে মরে যাস।'

তাই ক্লাস নাইনেই যখন কথা তুললেন বাবা তখন সুবোধদা বললেন—'আপনারা কি পাগল হয়েছেন মামা। এটুকু মেয়ে, পুরো-পুরিভাবে জীবন সম্বন্ধে একটা জ্ঞানও হয়নি এখনও আর এরই মধ্যে—'

'না বাবা, বুড়ো হয়ে গেছি। চোখের ওপর মেয়েকে আর কতো বড়ো করবো বলো।' বাবা বললেন পান চিবোতে চিবোতে—'মেয়ে বড়ো হলে বুড়োদের পাকা চুলে আরও পাক ধরে।'

'এত ভয় কেন আপনাদের। বয়স বাড়ছে বলে কি অপরাধ করেছে ঝর্ণা? পড়াশুনো করতে চাইছে করুক। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি ওর জীবনের কোন মূল্য দেবেন না? ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে ওকে নিয়ে পুতুল খেলতে চান।'

বাবা হয়তো এরপর কিছু বলেন নি সেদিন। পাশের ঘরে বইয়ের

ওপর চোখ রেখে উৎকর্ণ হয়ে সব শুনেছিল ঝর্ণা। চুরি করে কথাগুলো শুনে নিয়েছিলো।

'লেখাপড়া করে কি হবে বাবা।' বাবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মা—'মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে, গোটা জীবনটাই তো শেষে ঘরকন্না করে কাটাতে হবে। হাঁড়ি ঠেলতে হবে আমাদের মতো।'

'মোটেই না।' সুবোধদা প্রতিবাদ করলেন—'ঘর তো করবেই কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আগে পাশটাশ করুক।'

'আর কতোদিন? আমরা কিছুই করিনি সারা জীবনে সেজন্যে কি দুঃখ পেয়েছি কোন।'

বড়ো খেলো যুক্তি। সুবোধদা হাসলেন—'আপনারা যে সময়ে ওর মতো ছিলেন সে সময়ে তো ছেলেরাই পাশ করতো একশোয় একজন। আপনি সহর দেখেছেন বিয়ে হওয়ার পর, আর ঝর্ণা সহরের মেয়ে, স্কুলে পড়ে। কলেজটা না দেখে কি ছাড়বে? আর আপনারাই বা বাধা দেবেন কেন? আপনাদের যুগ দিয়ে তো ঝর্ণার দিনকে বিচার করা যায় না মামীমা।'

মাও চুপ করলেন। বাবা মৌন।

'অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আর তো মাত্র দুটো বছোর, তারপর না হয় তবু ভেবে দেখা যাবে। অন্ততঃ স্কুলের পড়া শেষ করুক।' সুবোধদা বোঝালেন সহজ ভাষায়—'পাশ করে ও যে সুখ পাবে, এখন কি তার চেয়ে বেশী সুখ ওকে দিতে পারবেন আপনারা?'

মা চুপ করলেন। বাবাও মুখ খুললেন না আর।

উজান স্রোতের মুখে বাঁধ বাধলেন সুবোধদা। রক্ষা করলেন ঝর্ণাকে। কিন্তু শান্তি পায় না ঝর্ণা, স্বস্তি পায় না এ'তে। ও জানে, আবার ভেঙে

যাবে এ বাঁধ, খড়কুটোর মতো ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অবাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে।

'ওঁরা আমায় রেহাই দেবেন না সুবোধদা।' সমস্ত শরীর ঢেলে দিয়ে খোলা বইয়ের ওপর একদিন লুটিয়ে পড়েছিল ঝর্ণা। চোখের জলকে রুখতে পারে নি—'বাবাকে আপনি চেনেন না। আপনাকে না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন এখানে ওখানে।'

'কি করে জানলি তুই? কে বলেছে তোকে।' ওর লুটোনো মাথা আল্‌তোভাবে তুলতে চাইলেন সুবোধদা—'ওসব তোর ভুল-ধারণা!'

'আপনি জানেন না।' আস্তে আস্তে মুখ তুললো ঝর্ণা। চোখ মুছলো আঁচল দিয়ে—'বেড়ানোর ছলে কাল বিকেলে মাসীবাড়ী নিয়ে গিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়েছে কতগুলো লোকের সামনে। ওদের অনেক বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে, গানও শোনাতে হয়েছে।'

'হুঁ।' কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হলেন সুবোধদা। চোখের মণিতে হঠাৎ যেন আগুনের হল্কা দেখা গেল—'তুই পড় ঝর্ণা। মন দিয়ে পড়। তোকে ভালো পাশ করতে হবে। আমি থাকতে তোর কোন ভয় নেই।'

'কিন্তু কি পড়ব সুবোধদা। মন নেই। স্কুলের মেয়েদের হাসতে দেখলে হিংসে হয় আজকাল। আমার মতো হয়তো এত কষ্ট করতে হয় না ওদের।'

'তুইও খুসীমতো চল্ ঝর্ণা। কোন ভয় নেই।'

এমনি ক'রেই এতদিন ওকে সাহস দিয়ে এসেছেন সুবোধদা। প্রেরণা জুগিয়েছেন।

সেদিন কিন্তু একটি লাইনও পড়াতে পারলেন না সুবোধদা। গম্ভীরমুখে উঠে গেলেন। রেখা আর বৃত্তাঙ্কিত জ্যামিতির পাতায় চোখ

রাখলো ঝর্ণা। মনে হল, অক্ষরগুলো যেন হাসছে ওর দিকে চেয়ে। স্নেহের হাসি।

'আপনারা কি চান মামাবাবু। মেয়েটার জন্যে এতটুকু মায়া হয় না। ও কি কেউ নয় আপনাদের।' থমকে দাঁড়ালো ঝর্ণা। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছিল কি কাজে যেন। থামলো, কান পাতলো। সুবোধদা বলছেন—'ফাইন্যাল পরীক্ষার আর মাত্র দু'মাস বাকী আছে। এখনও কি একটু পড়তে দেবেন না ওকে?'

'পড়ুক না।'

'অসম্ভব।' সুবোধদা যেন শান্ত নন আজ—'আপনারা যা শুরু করেছেন তা'তে ঝর্ণা কেন শুধু, কোন মেয়েই পড়তে পারবে না। একটা অনুরোধ করি মামাবাবু। আমার জন্যে নয়, ঝর্ণার জন্যে—ওকে পড়তে দিন। বড়ো ভালো মেয়ে, পড়লে অনেক ভালো ফল করতে পারবে বড়ো হয়ে। অনর্থক জোর করে বাচ্চা মেয়েটাকে কষ্ট দেবেন না এভাবে।'

'তোমরা ছেলেমানুষ সুবোধ। বুঝবে না এ' সব।' বাবাও আজ শান্ত নন খুব—'কেন, এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে এসেছো বলোতো। তুমি কি মনে করো, বাপ হয়ে আমি যা করছি সে আমার মেয়ের সর্বনাশের জন্যে? আজ বাদে কাল যদি ওর কোন বিপদ ঘ'টে যায় তখন কে দেখবে? এ' বুড়োকেই তো পাপের শাস্তি ভোগ করতে হ'বে তখন।'

'বিপদ?' চমকে ওঠেন সুবোধদা। বিস্মিত হন। বাইরে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা যেন শিউরে ওঠে হঠাৎ। রাগে, অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুবোধদা বললেন—'আপনি কি বলতে চান মামাবাবু? স্পষ্ট বলুন।'

'তোমরা তো সেদিনের ছেলে। কতটুকুই বা জানো। সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখলে কতো বিপদ যে হয় তা'র উদাহরণ তোমায় অনেক দিতে পারি। কতো চাও।'

'ওদের সম্বন্ধে আপনাদের এ অকারণ ভীতি, মিথ্যে আশঙ্কাই তো ঢের সর্বনাশ করে। ওরা যদি সৎ মনে কিছু করতে চায় তবে সেটাকেও আপনারা সন্দেহের চোখে দেখবেন অথচ ভাবেন না যে, নিজেদের জন্যে ওদেরও একটা মায়া আছে। হঠাৎ কিছু করতে ওরাও ভয় পায়।'

'এমন যে হয় না সেটা বলতে পারো।'

'হয়। কিন্তু ঝর্ণা সম্বন্ধে এসব কথা আপনি কি ক'রে ভাবেন। এতো ওকে অপমান করা। না, না ওকে অতো ছোট ভাববেন না। ওর ওপর আমার অনেক বিশ্বাস আছে।'

তারপর হয়তো অনেক কিছুই বলেছিলেন সুবোধদা কিন্তু সে সব আর শুনতে পারেনি ঝর্ণা। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যা শুনলো তারপর আর দাঁড়াতে পারেনি ও। সরে এসেছিল। বই পত্তর গুটিয়ে লঘুপায়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো রেলিংয়ের ধারে। আচ্ছন্নের মতো কতোক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিলো এমন ক'রে, মনে নেই ওর। তবে এটুকু মনে আছে—মনে মনে ও শপথ নিয়েছিলো সেদিন—মৃত্যুর শপথ। পড়াশুনো যদি নাই হয় জীবনে তবে মরবে। আত্মঘাতী হবে।

সে 'সব সন্ধ্যায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা কুমারী কন্যার ও'দুটি চোখের দিকে চেয়ে অনেকেই হয়তো অনেক কথা ভাবতে পারতো সেদিন। অন্য ব্যাখ্যা দিতে পারতো ঘন ঘন এ ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসের আর আষাঢ় আকাশের মতো অশ্রু সজল ও'দুটি চোখের।

উন্মত্ত পদ্মার মাঝ দরিয়ায় ভেসে বেড়ানোর মতো শঙ্কিত জীবন নিয়ে আরও কয়েকটা দিন গুনেছে ঝর্ণা। পরীক্ষার আগে রাত জেগেছে কিছুদিন, দিন দুপুরে সব ভুলে আপন মনে শুধু বইয়ের পাতা উল্টেছে।

সে সময়ে রোজই আসতেন সুবোধদা। পড়াতেন, বলতেন—'ভালো করে পড় এ'কটা দিন। ফার্স্ট হওয়া চাই-ই।'

পরীক্ষা দিলো ঝর্ণা। রোগ শয্যায় নয়, কিন্তু রুগ্ন দেহ আর ভগ্ন মন নিয়ে। খাতার পর খাতা লিখে এলো পর পর পাঁচ দিন। কিন্তু পারলো না শিপ্রাকে পেছনে রাখতে। দু' নম্বর সেরা ছাত্রী হয়ে নতুন ক্লাসে উঠলো ঝর্ণা। স্কুলগণ্ডীর সর্বশেষ সীমায়। আর মাত্র একটা বছোর বাকী। শুধু একটা বছোর।

খুসী হ'লেন সুবোধদা। মা-বাবাও তৃপ্ত হলেন। সোহাগ করলেন বুকে জড়িয়ে।

সুবোধদা বললেন—'আসছেবারে কিন্তু এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ফার্স্ট হওয়া চাই।'

'নিশ্চয়ই।' মনে আছে ঝর্ণার। বাবাও সেদিন সুবোধদার কথায় সায় দিয়েছিলেন। তারপর দিনকযেক সুবোধদাকে আসতে যেতে দেখেছে ঝর্ণা। সে সময় এসে বাবার সঙ্গে কি যেন কথা বলাবলি করতেন। কতো কিছু বোঝাতেন। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো সুবোধদার। বাবা একদিন নিজে ডেকে নিলেন ঝর্ণাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন—'তোর কোন ভয় নেই মা। তুই পড়। অন্ততঃ একটা মার্কা থাক।'

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন মা, পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন সুবোধদা।

উঃ, সেদিন কি ভালো লেগেছিলো মাকে, বাবাকে। নতুন ক'রে বাঁচবার প্রেরণা পেয়েছিলো ঝর্ণা। ঝড় থেমে গেছে, আর ভয় নেই।

নতুন ক্লাসের পড়াশুনো আরম্ভ করে দিলো নতুন উদ্যমে। আর মাত্র একটা বছোর বাকী। সে তো মাত্র এ'কটা দিন। দেখতে

দেখতে ফুরিয়ে যাবে। এই তো সেদিন ও 'এইট' থেকে 'নাইনে' উঠেছিলো। মনে হয় দিনকয়েক আগের ঘটনা।

হঠাৎ।

'সত্যি আকস্মিকভাবে সেতারের সাত তারের পঞ্চম তন্ত্রী শিথিল হয়ে গেলো। জমজমাট আসরে হঠাৎ ছন্দপতন যেন।

সুবোধদা বিয়ে করলেন। পূর্ব পরিচিতা কোন এক মেয়েকে। এম, এ পাশ, এখন মাষ্টারী করে। ঝর্ণা অবাক হয়নি খবরটা শুনে। অনেক আগেই ও শুনেছিলো সব। কিন্তু নাক কুঁচকোলেন মা-বাবা। সরবে ঘৃণিত মন্তব্য করলেন—'ছি ছি, কুলীনের ছেলে হয়ে শেষে কোন এক মিত্তিরের মেয়েকে—'

'দেখো, এই তো লেখাপড়া শেখার ফল। নাও, মেয়েকে তো পণ্ডী করে তুলেছো, এবারে ফিরিঙ্গি করো।' মার সক্রোধ হুঙ্কার।

ঝর্ণা জানতো—এ অসামাজিক ব্যাপারটাকে আর সকলে সহজভাবে গ্রহণ করলেও ওর মা-বাবা সইবেন না। কিন্তু ওর তো মনে হয়, ভালোই করেছেন সুবোধদা। লোকের ভয়ে তো আর আত্মপ্রবঞ্চিত হতে পারেন না তিনি। এই বেশ। দু'জনের ঘর, ছোট পরিপাটি। বই আছে মন ভোলাবার আর বুক ভরা প্রেম রয়েছে ঘর বাঁধবার। না, কোন ভুল করেন নি সুবোধদা। অসবর্ণ আবার কি? জাত কি কারও গায়ে লেখা থাকে? তাই যদি হবে তবে ব্রাহ্মণরা সব ফর্সা হ'লো না কেন, অব্রাহ্মণেরা কালো। জন্মেই যেমন মানুষ মানুষ, আর পশু পশু হয়ে থাকে।

সুবোধদাকে সমর্থন করলেও ঝর্ণার মন ভীত হয়ে ওঠে। একে কেন্দ্র করে আবার যদি আগ্নেয় পর্বত সজীব হয়ে ওঠে। সুবোধদা অনেক দূরে। কে ওকে সাহায্য করবে আজ, রক্ষা করবে কে?

হলোও তাই, সুবোধদা প্রথম যেদিন এলেন বিয়ে ক'রবার পর সেদিন বাবা যেন ফেটে পড়লেন তাঁর ওপর। অনর্গল বকে গেলেন। সুবোধদার যুক্তি টিকলো না। তারপর সেই যে গেলেন ওঁরা আর আসেন নি কোনদিন।

তারপরই ঝড় উঠলো আবার। ভয় পেলো ডানাভাঙ্গা চিল। এ ঝড়ের অপর নাম মৃত্যু। প্রথম প্রথম কানাকানি। মা আর বাবার জল্পনা। তারপরই মেঘ ঘনালো পরিচ্ছন্ন আকাশে, শান্ত আকাশে আকস্মিক গর্জন।

পরশু রাতে স্কুলের দেওয়া অঙ্কগুলো কষছিলো ঝর্ণা। খাওয়া দাওয়ার শেষে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনই নিরিবিলি আর মৌন মুহূর্তে স্কুলের দেওয়া বাড়ীর কাজ শেষ করে ও। অঙ্ক, নয়তো গ্রামার, ট্র্যানস্লেসান। সেদিনও ও ব্যস্ত ছিলো আপন কাজে।

'একটু শুনে যা মা।' শান্তি দেবী এসে ডাকলেন হঠাৎ।

মণ্টু আর লতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে এক পাশে। অন্যঘরে বাবা। অবাক হলো ঝর্ণা—'এতরাতে হঠাৎ কেন মা। কিছু বলবে?'

'শোন্।'

ঝর্ণা উঠে এলো। করিডরে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার কানে বিষ ঢাললেন মা। সবশেষে বললেন—'তোর বাবা কথা দিয়েছেন। পরশুদিন বিকেলে আসবে ওরা। বুঝলি।'

শিউরে উঠলো ঝর্ণা, বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো যেন। দাঁতে ঠোঁট চেপে বাক্‌রুদ্ধ হলো।

'যা, বেশী রাত করিসনে! ঘুমো গিয়ে।'

চলে যাচ্ছিলেন শান্তি দেবী। হঠাৎ দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরলো

ঝর্ণা। সমস্ত বুকের রস নিংড়োনো কান্নায় ভেঙে পড়লো হঠাৎ—'আবার, আবার তোমরা সুরু করলে মা।'

'তুই ভাবিস নে মা। আমরা কি তোর মন্দ চাই, বল্। তুই তো আমাদের মেয়ে।' চলতে চলতে থেমে দাঁড়ালেন মা। মেয়ের মাথায় হাত বুলোলেন আদর করে—'ভালো ছেলে সুহাস। আমার মেজদাকে তুই চিনিস তো। ওর শালা। বেশ ছেলে। ব্যবসা করে, বাড়ী আছে কলকাতায়। বিয়ে করে নাকি গাড়ী কিনবে শুনেছি। এমন ছেলে কি সহজে মেলে মা। এখন তোর ভাগ্য আর আমাদের কপাল।'

আরও জোরে মাকে দু'হাতে চাপলো ঝর্ণা—'না না মা। পারবো না আমি। অসম্ভব। আমায় রক্ষা করো। বাঁচাও।'

'কি পাগলামী হচ্ছে ঝর্ণা। ছাড়।' নিজ হাতেই মেয়ের আবেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন শান্তি দেবী—'এখনই কি তোর বিয়ে হচ্ছে নাকি? ওরা শুধু ভালো করে দেখে যাবে একবার। অবশ্য সুহাস তোকে অনেক আগেই দেখেছে। ওর ভালো লেগেছে বলেই তো মেজদাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। তাই তো বলি, এ তোর ভাগ্য, জোর বরাত।'

'না মা, এখন নয়। মাত্র এ'কটা দিন।'

রাত হয়েছে ঝর্ণা। ঘরে যা।' মা নন, পাশের ঘর থেকে বাবা হাঁকলেন। শ্মশান স্তব্ধতায় সিংহনাদ মনে হলো যেন।

'যা মা, ঘরে যা।' ফিসফিসিয়ে বললেন মা। তারপর ত্রস্তপায়ে নিজেই সরে পড়লেন।

দাঁতে দাঁত চেপে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ঝর্ণা। নীরব কান্নায় বুক ভরে গেলো। রাতের অন্ধকারে সে জল দেখলো না কেউ। নরম বুক দুলে দুলে উঠলো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না ও।

ছুটে এলো ঘরে। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লতা আর মন্টু। পড়ে আছে খোলা পাটীগণিত, আধকষা সরল কুসীদ বুকে নিয়ে তেমনি শুয়ে আছে খাতাটা। বুকটা যেন আবার একটা ধাক্কা খেলো হঠাৎ। ককিয়ে উঠলো। নীরবে নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো ঝর্ণা। প্রচুর কাঁদলো। বালিশে মাথা গুঁজে বালিশ ভেজালো। রাত দুপুরে কে যেন এসেছিলেন ঘরে। বাতি নিভিয়ে আবার চলে গেছেন। হয়তো বাবা।

সে রাতে ঘুমোয় নি ঝর্ণা। কেঁদেছে। সারারাত জেগেছে।

পরশুদিন। অর্থাৎ আজ।

আচ্ছন্নের মতো এতক্ষণ শুয়েছিলো ঝর্ণা। দু'চোখের জলে কখন যে বালিশের কিছু অংশ গোল হয়ে ভিজে গেছে খেয়াল করেনি ও। আজ ওরা আসবে। আসবেই। বিকেল চারটেয় বাবা আসবেন। হৈ হুল্লোড় করে কিছু মিষ্টি আনবেন, ঘর সাজাবেন। দলবল নিয়ে বর বেশে এসে ঢুকবেন সবাই। তরপর সুরু হবে কনে সাজাবার পালা। কোনদিন মুখে পাউডার না মাখলেও ওকে মাখতেই হবে আজ। চোখে কাজল টানতে হবে। জড়ি পাড় লাল শাড়ী ওকে জোর করে পরাবে সবাই। বিয়ের জন্যে করে রাখা অলঙ্কারগুলো গায়ে তুলতে হবে। এত আড়ম্বর কোনদিন করে নি ঝর্ণা। মনে মনে ঘৃণাই করেছে এতকাল, এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আজ সব করতে হবে। তারপর হাঁটি হাঁটি পায়ে গিয়ে বসতে হবে আগন্তুকদের মুখোমুখী। অবান্তর প্রশ্ন আসবে সব, রাগে শরীর পুড়ে গেলেও সে সবের উত্তর দিতে হবে। মার শেখানো মতো আর্ধেক মুখে রেখে আর্ধেক উচ্চারণ করতে হবে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে। দোভাষীর মতো বাবা সেটা বুঝিয়ে দেবেন তাদের। তারপর

অনুরোধ আসবে গান শোনানোর। সেও শোনাতে হবে। স্কুলের ক্লাসে শেখা গোটা পাঁচেক গান জানা আছে ওর। বাবা বলেছেন— 'এই যথেষ্ট, আর দরকার নেই।' তারপরই শেষ হয়েছে গানের ক্লাস করা। এরপর শেষ হবে ওদের জলযোগের পালা। কনে দেখা আলোর লগ্ন উৎরে গেলে পর মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে একে একে বিদায় নেবে সবাই। বলে যাবে 'পরে জানানো হবে।' দু'দুবারের অভিজ্ঞতায় আজ পুরোপুরি অভিজ্ঞ ঝর্ণা। অচল টাকা বাজিয়ে দেখার মত ওকে বাজিয়ে দেখবে ওরা। মধ্যযুগের ক্রীত-বিক্রীত ক্রীতদাসদের মতো। লজ্জায় অপমানেই শুধু নয়, ক্রোধেও সারা শরীর রি রি করে ওর। শিউরে ওঠে। ছিঃ, ছিঃ, এ আবার কী রীতি। চেনা নেই, শোনা নেই, কতগুলো পরপুরুষের সামনে একটা মেয়েকে সাজিয়ে দেখানো! যদি বিয়ে না হয় কোনদিন। তবে তো সে মানুষগুলো কোনদিন আপন হবে না আর। একটি ভদ্র কন্যাকে অপমান করার সুযোগ পাবে শুধু। কি দোষ করলো তবে রেস্তোরাঁ আর ফুটপাতের লোকগুলো। ছিঃ, ছিঃ, ওর সারা শরীর ঘিন ঘিন করে ওঠে। লজ্জায় নয়, ঘৃণায়। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ওর মন।

কিন্তু উপায় নেই। ও বড়ো অসহায় আজ। নিরুপায়। সুবোধদা কাছে নেই, কেউ রক্ষা করবে না ওকে, বাঁচাবে না কেউ।

ওরা এলো। প্রথামতো সবই হলো। পরে খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলো সাতটা নাগাদ, খবরও এলো দু'দিন পরে। হাতে নয়, ডাকে।

স্কুলে যাওয়ার জন্যে বেরোচ্ছিলো ঝর্ণা। একগাদা বই-খাতা বুকে চেপে। সঙ্গে লতা। দরজার মুখে পিওনের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার

উপক্রম। বাবার চিঠিটা হাতে পেলো ঝর্ণা। অপরিচিত হস্তাক্ষর। কেমন যেন সন্দেহ হলো ওর। বড়ো পাকা মেয়ে লতা। হয় তো মাকে বলে দেবে। ঝর্ণা বললো—'তুই একটু দাঁড়া লতু। মাকে আমি দিয়ে আসছি চিঠিটা।'

ঘরে ফিরে মায়ের হাতে কিন্তু চিঠিটা দিলো না ও। আড়ালে এসে বইয়ের ভাঁজে লুকোলো। তারপর স্কুলে এসে সতীর্থাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে হলো। নইলে ভয় আছে। বলবে—'প্রেমপত্র।'

একি ?

চমকে উঠলো ঝর্ণা······'অমত করিবার কি আছে বলুন। পাত্র যখন নিজেই স্বতোপ্রণোদিত হইয়া প্রস্তাব পাঠাইয়াছে তখন আমরা আর কি করিয়া অপছন্দ করি। প্রথানুসারে একবার দেখিতে গিয়াছিলাম মাত্র।' পড়তে পড়তে ঘেমে উঠলো ঝর্ণা। চোখ জলে উঠলো। তারপর আবার দৃষ্টি বুলিয়ে গেলো দ্রুত—'তবে সেইজন্য নয়, আপনার কন্যা আমাদের সত্যই মনঃপুত হইয়াছে। এক্ষণে যথাবিহিত অনুষ্ঠানাদি নিষ্পন্ন হইলেই মঙ্গল···' ব্যস্ত হাতে চিঠিটা বন্ধ করলো ও। দরকার নেই আর পড়বার। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে তাকালো চারদিকে। কেউ নেই। নিশ্চিন্ত মনে তিনতলার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে ছড়িয়ে দিলো আকাশে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে দুলতে দুলতে গোল হয়ে নেমে গেলো নীচে। সেদিকে তাকিয়ে ঝর্ণা হাসলো মনে মনে। উঃ, বাঁচা গেলো। ভাগ্যিস ওর হাতেই পড়েছিলো চিঠিটা। পরিতৃপ্ত মনে ও ক্লাসে এসে বসলো। ভয় নেই। মেঘ কেটে গেছে।

স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকছিলো ঝর্ণা। থমকে দাঁড়ালো। পাশের ঘরে কা'দের ফিস্‌ফিসানি যেন। সব কিছুই আজকাল বড়ো

সন্দেহের চোখে দেখে ও। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল। কান পাতলো। আবার ভয় পেলো ও। ঝিম্ হয়ে গেলো। মা আর মেজমামা।

'ওরা বলছে অঘ্রাণে।'

'অঘ্রাণে?' মা থামলেন—'কিন্তু ওর বড়ো ইচ্ছে ম্যাট্রিকটা পাশ করে। ওদের বলো না আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুক।'

'পাশ!' মেজমামা অবাক হলেন যেন—'বলছিস কি? তাহলে কি এ ছেলে পাবি ভেবেছিস।'

'কেন?'

'কেউ কি আর নিজের চেয়ে বউকে ওপরে উঠতে দেয়? দেয় না।'

অসহ্য। আর দাঁড়ালো না ঝর্ণা। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো। না, এরা বাঁচতে দেবে না ওকে। মেরেই ফেলবে। অথচ এ'জন্যে কোন দোষ করেনি ঝর্ণা, অপরাধও নয়। ত্রুটি শুধু একটি, জন্মগত ত্রুটি। ছেলে হয়ে জন্মাতে পারেনি, মেয়ে হয়ে জন্মেছিলো।

দেশটা যখন বাংলাদেশ তখন এটা ত্রুটি নয়—পাপ।

বুক থেকে বইয়ের বোঝা টেবিলে নামালো ঝর্ণা। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনটা যেন কেমন করলো হঠাৎ। গুমরে উঠলো। বুকের আত্মার মতো সযত্নে এগুলো বুকে চেপে রেখেছে এতকাল। এগুলোকে আজ বুঝি সরিয়ে দিতে হবে। বুকে চেপে রাখতে চাইলেও বুঝি টেনে নেবে সবাই। সে'কথা ভাবলেও ঝর্ণার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। প্লাবন নামে যেন।

ঘর বন্ধ করে সেদিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ঝর্ণা। প্রায়া-ন্ধকার গুমোট ঘর। একা একা বসে আপন মনে আকাশ পাতাল

ভাবলো। কাঁদলো। কিন্তু কেউ বুঝলো না ওর মন, ওর ব্যথা। বাইরে সেই ষড়যন্ত্র, ওর মৃত্যুর চক্রান্ত।

সেদিন সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ঝর্ণা। রান্নাঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন মা। দরজার ধারে গা ছুঁয়ে আলতোভাবে দাঁড়ালো। ডাকলো—'মা।'

'কিছু বলবি?'

'তোমরা কি সত্যি সব ঠিক করে ফেলেছ মা।' আঁচল কোণে চোখের জল মুছলো ঝর্ণা—'আর ক'টা দিন তোমরা পারলে না অপেক্ষা করতে। আর মাত্র মাস ছ'য়েক।'

'ওসব আমায় বলতে এসেছিস কেন। বাপকে গিয়ে বল।'

'অমন করো না মা। দোহাই তোমার, একটু শোন—' আরও একটু এগিয়ে এলো ঝর্ণা। মা'র কাছে এসে বসলো—'আমি তোমার কথা দিচ্ছি মা, পরীক্ষা দিতে দিলে আমি ভালো পাশ করবো। ছ'টা মাস, তারপর আমায় নিয়ে তোমরা যা খুসী তাই করো, কিছু বলবো না। বাধা দেব না।' বলতে বলতে লুটিয়ে পড়লো ঝর্ণা। মায়ের পা জড়িয়ে ধরলো।

'এই দেখো, কি হচ্ছে এসব।' বলতে বলতে নিজেই দু' পা সরে যান শান্তি দেবী—'বিয়ের নামে অমন অনেক মেয়েকেই কাঁদতে দেখেছি বাপু কিন্তু এমনটি দেখিনি। আরে, আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তোর বাপের বয়স কত ছিলো জানিস? মাত্র উনিশ।'

'তা হোক মা।', ঝর্ণা মাথা তুললো আবার—'এ' বিয়ে করবো না আমি। এখন তো নয়ই।'

'করবি না তো করবি কি?'

'পড়বো।'

'পড়বো।' বড়ো শ্রীহীন একটা অঙ্গভঙ্গী করলেন শান্তি দেবী।

বড়ো বিশ্রী ঠেকলো ঝর্ণার কাছে—'পড়ে পড়ে তো শেষে ওই সুবোধদা হবেন। লেখাপড়ার দৌড় ঢের ঢের জানা হয়ে গেছে।' যেমনি ছেলে সুবোধ তেমনি বিয়েও করেছে একটা—'

ক্রমে ক্রমে মা উগ্র হয়ে উঠছেন, কথাবার্তার সংযম হারাচ্ছেন। লক্ষ্য করলো ঝর্ণা। কিন্তু কি ক'রে তাঁকে বোঝাবে ঝর্ণা—লেখাপড়া না শেখার ফল তিনি নিজে, আর সুমিত্রা বৌদি যে কতো উঁচু জাতের মেয়ে সেটা বোঝার ক্ষমতাও নেই কারও। আর, আর—

রান্নাঘর থেকে উঠে এলো ঝর্ণা। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলো। আর কি করেই বা বোঝাবে ও মাকে, বাবাকে—সুবোধদা আর যাই করুন তাঁর মত স্বামী পেতে সব মেয়েই চায়। সেজন্যে সুমিত্রা বৌদির মতো নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। ঝর্ণা তো তাই চায়।

অফিস থেকে ফিরে এসে সবই শুনলেন বাবা। সত্যের সঙ্গে মিথ্যে মিশিয়ে কি বলেছেন মা তা অবশ্য জানে না ঝর্ণা। তবে শুনলো, ওর বন্ধ দরজার কাছে এসে চীৎকার করে বলছেন বাবা, ওকে শোনাচ্ছেন—'আমি কিচ্ছু শুনবো না, অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি, এবার আর নয়। এ বিয়ে হবেই আসছে অঘ্রাণে। হতেই হবে।'

কি যেন মনে হ'লো। চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালো ঝর্ণা। মনে মনে শক্ত করলো নিজেকে। ছুটে এলো দরজার কাছে। বাবার পা জড়িয়ে ধরবে ও আজ। চোখের জলে পা ভিজিয়ে দেবে, প্রাণভিক্ষা চাইবে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ঝর্ণা।

জুতো পরে কোথায় যাবার জন্যে যেন তৈরী হচ্ছিলেন বাবা। গম্ভীর মানুষ। আজ যেন আরও গম্ভীর। চোখে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই।'

রেলিংয়ের কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো ঝর্ণা। শুনছিলো সব। সরে এলো এবার। অসহ্য। মা-বাপ হয়ে শেষে এমনি করে ওকে জ্বালাবে ওরা। এদিকের ঘরে মেঝেতে মাদুর ছড়িয়ে পড়ছিলো মণ্টু আর লতা।

'দিদি।' ঝর্ণাকে ঢুকতে দেখে লতা বললো—'গীতাদি আজ তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো আমাকে।'

'কে?' হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ঝর্ণা।

'গীতাদি। সেই যে, তোর খুব বন্ধু। খালি সিল্কের শাড়ী পরে। খুব বড়লোক।'

'ওঃ।' গম্ভীর একটা দীর্ঘশ্বাস উথলে উঠলো ঝর্ণার বুক ঠেলে—'কি বললো?'

'জিজ্ঞেস করলো, তুই স্কুলে যাচ্ছিসনে কেন। তোদের পরীক্ষা নাকি খুব কাছে এসে গেছে। মাত্র এক মাস বাকী। সেইটেই জানাতে বলেছে তোকে।'

এক মাস? ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো ঝর্ণা। পাতা ওল্টালো। পাঁচই অঘ্রাণের আর কতো দেরী? সেও একমাস।

'আবার যদি কেউ তোর কথা জিজ্ঞেস করে তবে কি বলবো দিদি?' লতা আবার প্রশ্ন করে।

ক্যালেণ্ডারের অক্ষরগুলো থেকে চোখ ফেরায় ঝর্ণা—'থাক, কিছু বলতে হবে না তোকে। বলিস, অসুখ ক'রেছে আমার।'

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে ঝর্ণা। দু'টো মাত্র ঘর একটা ফ্ল্যাটে। একঘরে মা বাবা অন্য ঘরে লতা। ন' বছোরের এই একফোঁটা মেয়েটাই যে কি ভীষণ তা আজ ভালোভাবেই বুঝেছে ঝর্ণা। বিয়ে ব্যাপারটা যে অকারণে মেয়েদের দেহে একগাদা লজ্জা এনে দেয় সেটা পর্যন্ত বুঝেছে মেয়েটা।

বিশে কার্তিক।

সোনা কাপড় হয়ে গেলো যথারীতি। শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনিতে মুখর হলো বাড়া। সোনার হার, কয়েক গাছা চুড়ি আর বেনারসী, সিল্ক জর্জেটের বিনিময়ে ঝর্ণার উত্তর জীবন নির্ধারিত হলো।

গীতা এলো পরদিন দুপুরে। বললো—'শুনলাম অসুখ হয়েছে তোর। স্কুলে এখন অনেক কাজ। পুরোদস্তুর পড়াশুনো চলছে। তাই এতদিন আসতে পারি নি। আজ শনিবার। তাই এলাম।'

শুকনো হাসি হাসলো ঝর্ণা। অভ্যর্থনা জানালো—'বোস।'

'সত্যি, ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে তোর চেহারা। বড্ডো শুকিয়ে গেছিস।' গীতা বসলো চেয়ারে। তাকালো বান্ধবীর দিকে—'কি হয়েছিলো রে?'

'কিছু না। এমনি জ্বর।'

'স্কুলে যাবি কবে থেকে। টেষ্ট তো এসে গেলো। কল্যাণীদি, উর্মিলাদি তোর কথা বলছিলেন সেদিন। এ'সময়ে এ'ভাবে স্কুল কামাই করা খুব খারাপ।'

নীতা, শিপ্রা, বেলা, মীনা, কল্যাণীদি, উর্মিলাদি, যুথীদি। সকলের কথাই মনে পড়ে ঝর্ণার। স্কুলের ছবি ভেসে ওঠে চোখে। কেমন যেন করে মনটা।

'কি রে, এমন গম্ভীর কেন? খুব পড়ছিস্ বুঝি?'

'নাঃ।' হঠাৎ যেন সব হাল ছেড়ে দেয় ঝর্ণা—'কই আর পড়ছি, মন বসছে না।'

'পড়, পড়।' গীতা দিদি সাজলো এবার—'শিপ্রা কিন্তু খুব খাটছে।

এবারে যদি ওকে হারাতে না পারিস্ তবে আর জীবনে সুযোগ পাবিনে। এরপরে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ব কে জানে।'

আহত হলো ঝর্ণা। কে যেন সজোরে ওকে আঘাত করলো বুকে। থাক্, সব কথা খুলেই বলা যাক্। তা'হলে হয়তো অমন ক'রে ওকে ব্যথা দেবে না গীতা। পীড়ন ক'রবে না।

'ও কিরে ঝর্ণা। তোর চোখে জল।' গীতা অবাক হয়ে তাকায় —'কি হয়েছে তোর?'

'কিছু না। ও কিছু না।' হঠাৎ ভেঙে পড়ে ঝর্ণা। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে মুখ চাপে আঁচলে—'তুই আজ চলে যা গীতা। যা ভাই! পরে আসিস একদিন, বলবো, সব বলবো।'

বিস্মিত হয় গীতা। যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। হাত রাখে বান্ধবীর শোওয়ানো মাথায়— 'ঝর্ণা শোন।'

জলে ভরা চোখ তুলে তাকায় ঝর্ণা—'বল্।'

'কিছু মনে করিস্‌নে ভাই।' গীতা বললো ধীরে ধীরে—'তোর ইংরাজী খাতাটা একটু দিবি দিন কয়েকের জন্যে। সেই যে তোর দাদা না কে যেন লিখে দিয়েছিলেন।'

'নে।' টেবিলের কোণে তেমনি পড়ে আছে খাতাগুলো। বই নেই একটাও। গীতা ভাবলো, হয়তো অন্য ঘরে। একটা খাতাই শুধু নয়, অনেক খাতাই ঝর্ণা দিলো গীতার হাতে—'নে এগুলো। পড়াশুনো তো আর হচ্ছে না এখন। নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিস্।'

'দেব।' খুসীমনে চলে যায় গীতা।

ফিরিয়ে অবশ্য দিয়েছিলো গীতা। লতার হাতে আবার সেগুলো

পাঠিয়ে দিয়েছে ঝর্ণা। সে সঙ্গে সত্য কথাটাও জানিয়ে দিয়েছে—'আসছে পাঁচই অঘ্রাণ আমার বিয়ে। আসিস্।'

এগিয়ে আসছে পাঁচই অঘ্রাণ।

ঝর্ণা পারলো না নিজেকে বাঁচাতে। নিয়তির হাত থেকে পারলো না রক্ষা করতে। ঠিক এমনি করে একদিন আগুন জ্বলেছিলো ফরাসী কুমারী জোয়ানের চোখের সামনে। মৃত্যুর মশাল। কিন্তু সে আগুনে দগ্ধ হয়ে মুক্তি পেয়েছিলো জোয়ান।

কিন্তু।

এ মৃত্যুতে নিষ্কৃতি পাবে না ঝর্ণা। এ জীবনের পরেও আরেক জীবন আছে। স্বপ্নরাঙ্গা এ জীবনের ভস্ম হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সানাই বাজলো নির্ধারিত দিনে। লোকজন এলো, হৈ হুল্লোড় বাড়লো। কোন ত্রুটি নেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির। মা বাবা, আহুত আত্মীয়স্বজন সবাই আজ কর্মচঞ্চল। ত্রিপলের ছাউনি পড়েছে ছাদে, বাইরের দরজায় সজ্জিত তোরণ। বিজয়ের আনন্দে অনেক খরচ করেছেন ঝর্ণার বাবা। প্রথম মেয়ে বলেই হয়তো উজাড় করেছেন সব।

অনেক কেঁদেছে ঝর্ণা। শেষ তিনদিন উপোস করে কেঁদেছে, নিদ্রাহীন বিগত রাতগুলো বড়ো অসহ্য মনে হয়েছে ওর। কান্নার মাত্রাটা আজ যেন বেশী। সবাই বললো—ওটা স্বাভাবিক, বিয়ের রাতে সব মেয়েই কাঁদে অমন করে। স্বামীকে আপন করে চিনতে পারলেই এ' কান্নার কথা ভুলে যায় সবাই। ও-ও ভুলবে।

সত্যি' এ মুহূর্তেও কেউ বুঝলো না ওকে। চেষ্টাও করলো না কেউ কোনদিন।

যথারীতি সবই হলো। প্রথম মুহূর্তে অধিবাস, দুপুরে হলুদ স্নান, আরও এটা ওটা, উপবাসে ক্লান্ত, মনোব্যথায় ভগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন যেন ছিনিমিনি খেললো সবাই।

লগ্ন এলো। বর বসে গেছে বিয়ের আসরে। ঘরের ভেতর তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা। এই বুঝি ডাক এলো। এখনই বুঝি নিয়ে যাবে ওকে। রক্ত রংয়ে ঝর্ণাকে আজ সাজিয়েছে সবাই। লাল ব্লাউজের ওপর লাল বেনারসী। সর্বাঙ্গে স্বর্ণদ্যুতির ঝলকানি। চন্দন চিত্রিত ললাটের মধ্যবিন্দু রক্তসিঁদুর, বায়স ডানা ভ্রূর নীচে কাজলটানা চোখ। গলায় ফুলের মালা আর গাছ কৌটো হাতে। আলপনা আঁকা পিঁড়ির ওপর ধ্যানমগ্না মূর্তি। চোখের জলে কাজল কালো চোখের কালিমা মুছে যাচ্ছে বুঝি। পরিবৃতা মেয়েরা অবাক হলো দেখে। মন্তব্য করলো অপরূপ রূপসী ঝর্ণা। এ রূপ এতদিন যেন কোথায় লুকোনো ছিল।

হঠাৎ কলকণ্ঠে কাকলি ছড়িয়ে কতগুলো মেয়ে এসে ঢুকলো ভেতরে। নানা রংয়ে রঙীন্ একঝাঁক প্রজাপতির মতো। ওরা ঘিরে বসলো ঝর্ণাকে। হেসে উঠলো। হাসি নয়, সেতারের সাত তারের ওপর মির্জাফটা কে যেন বুলিয়ে দিলো হঠাৎ।

'কি রে।' ঝর্ণার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়লো গীতা—'কি মজা। এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ফেললি। আর বুঝি সবুর সইছিলো না।'

রস রসিকতার ধার ঘেসলো না ঝর্ণা। ওদের সান্নিধ্যে মুখটা যেন আরও করুণ হয়ে উঠলো ওর—'এত দেরী করলি যে?'

'দেরী হলো। আবার আমরা এক্ষুণি চলে যাব ভাই, কাল আবার পরীক্ষা আছে। টেষ্ট চলছে কি না।'

'কি বললি?' হঠাৎ নির্মমভাবে কে যেন চাবুক মারলো ঝর্ণাকে—'ওঃ, টেষ্ট চলছে বুঝি।'

'হ্যাঁ।'

'আজ কি ছিলো?'

'ইংরেজী।'

'কাল?'

'বাংলা।'

'ওঃ।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ঝর্ণার বুকটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিলো। মিহিগলায় প্রশ্ন করলো ও—'কেমন দিচ্ছিস তোরা।'

'ভালোই।' বললো বেলা—'সত্যি, প্রশ্ন এত সহজ হয়েছিলো, কি বলবো। তুই দিলে নিশ্চয় খুব ভালো করতে পারতিস।'

আবার, আবার আরেকটা চাবুক। ঝর্ণার চোখে তখন অশ্রুপ্লাবন। ডুকরে কাঁদছে ওর মন।

বাইরের দরজায় দুটো ছায়া এসে পড়লো। কনে নেবার সময় এসে গেছে।
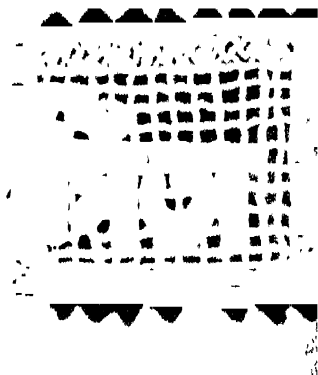
ফিরে এল উৎপলা।

খবরটা অবশ্য চিঠিতেই জেনেছিলো সবাই। ছোট একটা চিঠি একটুকরো সাদা কাগজ শুধু। কিন্তু গুটি গুটি ওই অক্ষরকটাই একদিন সারা সংসারে ঝড়ের হাওয়া বয়ে এনেছিলো। প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গ। তিনরাত, তিনদিন শুধু চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন বাসন্তী দেবী, স্বামীর সামনে যাননি ও'কটা দিন। প্রিয়নাথ খাঁটি পুরুষ। চোখের জলে বুক ভাসাননি, বুকের আগুনে পুড়েছেন। অফিস থেকে চেয়ে নিয়েছেন প্রাপ্য ছুটির দিনগুলো থেকে গুটিকতক দিন। কাটিয়েছেন নিরিবিলিতে, ভেবেছেন অনেক। ঠিক করলেন বুড়ো-বুড়ী গিয়ে একবার দেখে আসবেন মেয়েটাকে। দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষা শুধু।

পত্র নয়, উৎপলা নিজেই এল।

অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন প্রিয়নাথ। ধুতি আর পাঞ্জাবী গায়ে এঁটে জুতোর ফিতে বাঁধছিলেন। পাশে বাসন্তী দেবী। স্বামীর পেছনে চেয়ারের গায়ে হাত। এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়াল উৎপলা। শরতের আকাশে ডানা মেলা শকুনের মতো। কেঁপে উঠলেন দু'জনেই। ভয় পেলেন যেন। ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন বাসন্তী দেবী। ভেঙ্গে পড়লেন, ডুকরে কেঁদে উঠলেন আবার।

কঠিন পুরুষ প্রিয়নাথের বুকও কেঁপে উঠল, শিউরে উঠল। হয়তো এ'অবাঞ্ছিত মেঘের জন্যে তৈরী ছিলেন না বলেই।

এ' ছবি, ঠিক এমনি একটা দৃশ্য মনে মনে আগেই কল্পনা করেছিলো উৎপলা। সারা পথ ভেবে ভেবে এসেছে। কিন্তু নিজেও বুক বেঁধেছে, শক্ত বাঁধুনীতে মন গড়েছে। না, ভেঙ্গে পড়বে না ও। মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেবে, বোঝাবে—জীবনটা ঠুনকো কাঁচকঙ্কন নয়।

কিন্তু।

মাকে জড়িয়ে ধরেই আঁৎকে উঠল উৎপলা। রক্তসিঁথি চোখ এড়ালো না। হাতের দিকে চোখ পড়তেই বুকটা যেন ককিয়ে উঠল আবার। একগোছা সোনার চুড়ির ভীড়ে সরু একটা শঙ্খশুভ্র হাত-বলয়। ওই একটুকরো শুভ্রতাই যেন পরিহাস ক'রছে ওর শুচিশুভ্র সর্বাঙ্গকে। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল উৎপলার। ঝড়-ঝাপটে লুটিয়ে পড়া অশ্বত্থের মতো ভেঙ্গে পড়লো ও। লুটোলো মায়েরই পায়ে।

শক্ত হয়ে বসেছিলেন প্রিয়নাথ। চেয়ারের হাতলদুটো কঠিন হাতে ধরে, দাঁত চেপে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। বুঝি আর পারলেন না। চোখের জল বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পডল হঠাৎ। উঠে দাঁড়ালেন। ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। পথে নেমেও ওদের কান্নার শব্দ শুনলেন প্রিয়নাথ। ঘরের বাইরেই শুধু নয়, সারা কলকাতায়। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন সে কান্নার স্বর। সেই কর্কশ রাগিনী। সমস্ত পৃথিবীই যেন উৎপলা আজ। আলো নেই; সুখ নেই কোথাও।

বেলা গড়ালো অনেকখানি। তবু থামলো না উৎপলা। এ'কান্নার যেন শেষ নেই, অন্ত নেই কোন। এ'ঘর ও'ঘর থেকে অনেকেই এল। সান্ত্বনা দিলো, সমবেদনা জানালো এসে। তবু, তবু উৎপলা

শুরু হ'ল না। তারপর সূর্য্য যখন মধ্যাকাশের সীমা ছাড়ালো তখনই শান্ত হ'ল ধীরে ধীরে। কান্না বন্যার বাঁধ বেঁধে নয়, ঘুমিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েই পড়ল উৎপলা।

শুধু বসে বসে মেয়ের পিঠে হাত বুলোলেন বাসন্তী দেবী। অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েকে। বারবার দেখেও যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তাঁর—এ' সত্য, একান্ত ধ্রুব। এ' বয়সেই ঘর ভাঙলো উৎপলার। বাসন্তী দেবীর নিজহাতে গড়ে দেওয়া ঘর।

হাঁপাতে হাঁপাতে আকস্মিক ঝঞ্ঝার মতো ছুটে এলেন প্রিয়নাথ। পরিশ্রমে ক্লান্তদেহ টলছে রীতিমতো।

বারো নম্বর ফ্ল্যাটের সুলোচনাদি, ও'ঘরের মেনকা, মঞ্জু আর যারা ছিলো চোরের মতো গা গুটিয়ে সরে পড়লো সবাই।

হাতের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন প্রিয়নাথ। বললেন—'নাও, ধরো!'

'কি এ'সব?' কোল থেকে ধীরে ধীরে মেয়ের মাথাটা মেঝেতে নামালেন বাসন্তী দেবী। স্বামীর হাত থেকে নিলেন কাগজের মোড়কটা —'কি আনলে হঠাৎ?'

'দেখোই না খুলে, ওর জন্যে দু'টো কাপড়। সাত সকালে আবার পাঁচশটি টাকা ধার ক'রতে হ'ল আর কি?' স্ত্রীর হাতে প্যাকেটটা দিয়ে ঘুমোনো মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ— 'উৎপলা, ওঠ মা। শোন্।' সাড়া দিলো না উৎপলা। চোখের জলে ভেজা শোকাকুল মুখে ঘুমের প্রশান্তিমাখা যেন। অবাক হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন প্রিয়নাথ। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখেও জল বইয়ে আনলেন।

প্যাকেটটা খুলেই চমকে উঠলেন বাসন্তী দেবী—'একি, এ যে শাড়ী?'

চমক ভাঙলো প্রিয়নাথের। তাকালেন স্ত্রীর দিকে—'কেন, অবাক হলে নাকি ?'

'এ' বুড়ো বয়সে কি মাথা খারাপ হলো তোমার। এ' শাড়ী পরবে নাকি ও ?'

'কেন, ক্ষতি কি ?'

'শাঁখা-সিঁদুরের মতো এরও শেষ এখানেই।'

'কিন্তু উৎপলা পরবে এ'সব। পরতেই হবে ওকে। তোমাদের মতো মেয়েমানুষ আমি নই। ও'সব শাস্ত্র-সমাজের ভয় দেখিও না আমায়।' ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে এলেন প্রিয়নাথ।

'কিন্তু—'

'না, কোন কথা শুনবো না আমি। আমার কথা শুনতে হবে তোমাদের।'

স্বামীর সঙ্গে প্রতিবাদ করতে মাথা তুললেন বাসন্তী দেবী—'আর এতো বড়ো অধর্ম্মও আমাদের সইবে ভাবছো ?'

'সইবে, সইবে, খুব সইবে।' প্রিয়নাথের চোখ জ্বলে উঠলো হঠাৎ। গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন—'তুমি না মা ? এতটুকু দয়া হয় না, এতটুকু মায়া মমতা নেই তোমার ? মেয়েটাকে এমন করে রেখে ও'সব পরে ঘুরে বেড়াতে পারবে তুমি। কষ্ট হবে না ? কাঁদবে না ?'

সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন হিম হয়ে গেল বাসন্তী দেবীর। এতো বড়ো কথা শোনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। কল্পনাও করেননি কখনও। তাই নতুন শাড়ীখানা দু'হাতে ধরে সজোরে চোখ চেপে ধরলেন। যেন কান্না লুকোতে চান।

মুখ থেকে আচম্‌কা খসে পড়া কথাটার গুরুত্ব বুঝলেন প্রিয়নাথ। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন পথে।

স্বামী চলে যাওয়ার পরও আরেক ঝলক কান্না। বন্যায় ভেসে যাওয়া গ্রামের ওপর যেন আরও একটা উজান স্রোত।

তারপর মেয়ের দিকে এগিয়ে এলেন বাসন্তী দেবী। আঁচল দিয়ে বিবর্ণ মুখ মুছে দিলেন, মাথার চুলগুলো সরিয়ে দিলেন গাল থেকে। ইতিমধ্যে চোখ খুলে তাকিয়েছে উৎপলা। বাসন্তী দেবী ডাকলেন—'ওঠ মা, ওঠ লক্ষীটি।'

ধীরে ধীরে উঠে বসলো উৎপলা। মায়ের হাত ধরে টলতে টলতে ঘরে এসে দাঁড়ালো।

'যা, স্নান করে শাড়ীখানা পরে আয়।' বাসন্তী দেবী বললেন।

'এ' যে নতুন শাড়ী মা।'

'হ্যাঁ, তোর বাবা আনলেন তোর জন্যে। বললেন—পরতে হবে।'

'কিন্তু—' ভয়ে-বিস্ময়ে মায়ের দিকে তাকালো উৎপলা—'শাড়ী তো আমি পরতে পারিনে মা।'

'কেন, আজকাল তো অনেকেই পরে। তুই পর, ওতে দোষ নেই।'

'না মা, থাক্। বাবা পুরুষমানুষ। অতোসতো জানেন না, সে জন্যে কি আমরাও ধর্ম্ম হারাবো।'

'সে তো আমিও বলেছিলাম মা। কিন্তু ও কি কারও কথা শুনবে।'

'থাক্ মা, বাবাকে আমিই বোঝাবো।'

'তবে থাক্।' ছোট একটা শ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে ঝোলানো দড়িতে শাড়ীদুটো রাখলেন বাসন্তী দেবী।

'হ্যাঁ থাক্। ও না হয় তুমিই পরো।'

'আমি পরব?' সমস্ত শরীর আবার যেন শিউরে উঠলো বাসন্তী দেবীর।

'কেন মা, তুমি তো আজও পারো।'

'ওঃ।' কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন বাসন্তী দেবী। রান্নাঘরে অনেক কাজ বাকী। আজ থেকে দুই উনুনের কাজ।

স্নান সেরে ফিরে এলো উৎপলা। ভেজা কাপড়টা রেলিংয়ে ঝুলিয়ে দিলো। ব্লাউসটাও। ঘরে ঢুকে চারদেয়ালে চোখ বুলোলো ও। ঠিক তেমনি আছে সব। দেয়ালের এদিক থেকে ওদিকে বাঁধা দড়িতে ঝোলানো জামা-কাপড়। এককোণে বাক্স আর স্যুটকেশের স্তুপ, অন্যদিকে লক্ষ্মীর আসন। দু'বছোর আগে উৎপলাই নিজেহাতে পুজো দিত রোজ। তারপর মা দিয়েছেন। এবার থেকে আবার সে ভার নিজ হাতে তুলে নেবে উৎপলা। দু'বছোর আগের সেই পুরোণো উৎপলা হবে আবার ও। সব দেখতে দেখতে চোখটা হঠাৎ ঠিকরে পড়ল দেয়ালে টানানো ছবিগুলোর দিকে। দু'পাশে মা আর বাবা। মাঝখানে ও। সেই কুমারী বয়সের ফটো। ঈর্ষা হয়। নিজের এ' ফটোকে নয়, ও' বয়সটাকে। ধীরে ধীরে আরসীটার সামনে এসে দাঁড়ালো উৎপলা। আশ্চর্য্য মিল। দু'টো বয়স কিন্তু একই মেয়ে উৎপলা। সাদা ফ্রকের বদলে আজ শুধু সাদা শাড়ী গায়ে। সাদা কপাল, সাদা সিঁথি। সব এক। কিন্তু এরও মধ্যে একটা জীবন ছিলো। রঙীন জীবন। সে জীবন মরে গেছে, মুছে গেছে। ছলো-ছলো চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। দু'গালে গড়িয়ে পড়ে। আয়নায় মুখ পড়তেই চমকে উঠল উৎপলা। আঁচল কোণে মুছে নিল। চিরুণীটা হাতে নিয়ে মাথার চুল ছুঁয়েছে সবে, এমনি ঝমঝম কড়া নড়লো। কে যেন এল। দরজার কাছে এগিয়ে এল। রান্নাঘর থেকে আসছিলেন বাসন্তী দেবী। উৎপলা বলল—'তুমি যাও মা। আমি খুলছি।'

চলে গেলেন বাসন্তী দেবী। গেটের দিকে এগোলো উৎপলা।

দরজা খুলেই চমকে উঠল। চোখে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে রইলো দু'জন।

মুহূর্তমাত্র। তারপর উৎপলাই আহ্বান জানালো—'এসো।'

এই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েও কিছুক্ষণ নড়তে পারলো না রমেন। মাথা নুয়ে আঙ্গুলের নখ খুঁটলো দাঁতে। সেই উৎপলা। সেই কিশোরী কন্যা! শিশির ধোওয়া রজনীগন্ধার মতো শুচিশ্বেতা মেয়ে। সুশুভ্র মরাল বরণা। সর্বাঙ্গে শুচিতার প্রলেপ বুলোনো। কিন্তু এ' তো কোনদিন চায়নি রমেন। কেউ না।

'ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো।' একটু স্মিত হাসলো উৎপলা।

'তোমায় এ'ভাবে দেখবো জানতাম। তবু, তবু যেন মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হতো।' ভেতরে পা বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বললো রমেন।

'কেন রমেনদা।' চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো উৎপলা। ছোট একটুকরো হাসি ঠোঁটের কোণে ভাসিয়ে দিলো—'মনে আছে তোমার, সে'বারের পূজোয় যখন তোমারই দেওয়া সাদা সিল্কের শাড়ীটা পরে সামনে এসে দাঁড়ালাম—তুমি বলেছিলে, এ'শাড়ী নাকি শুধু আমাকেই মানায়। আমাদের মতো দুধে-ধোওয়া মেয়েদের।'

কোন উত্তর দিলো না রমেন। এ'কথার উত্তর নেই।

চুলের ভীড়ে চিরুণী ডুবিয়ে একটা আঁচড় টানলো উৎপলা। মাথা থেকে পিট অবধি—দেখো মা, কে এসেছে।

কাছেই ছিলেন বাসন্তী দেবী। বেরিয়ে এলেন—'একি, রমেন যে?'

প্রণাম করলো রমেন। বললো—'ভালো আছেন।'

'আজকের দিনে তুমি, এ'প্রশ্নই করলে বাবা।'

বিব্রত হ'য়ে হঠাৎ মাথা নোওয়ালো রমেন। কথাটা সে ভেবে বলেনি। হঠাৎ বলেছে।

'তুমি ভালো তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বাসন্তী দেবী—'কতোদিন পরে এলে। উৎপলার বিয়ের আগে সেই যে গেলে তারপর বুঝি এই প্রথম।'

আনত মাথা লজ্জার ভারে আরও নত হলো। রমেন বাকরুদ্ধ আজ।

'তুমি যে কি বলো মা, ঠিক নেই। পুরুষ মানুষের কতো কাজ থাকে, ঘুরে বেড়ানোর সময় কোথায় তাদের।' উৎপলার দয়া হলো রমেনের অসহায়তা দেখে।

'না, প্রিয়নাথকাকাই গিয়েছিলেন আমার অফিসে। বলে এলেন উৎপলা এসেছে। যেন দেখা করি। অবশ্য যাই।'

'কে, বাবা?' উৎপলার চোখে মুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ।'

মা আর মেয়ে চোখে চোখে তাকালো।

'তা আসবে বইকি বাবা, নিশ্চয়ই আসবে।' বাসন্তী দেবীই উচ্ছল হয়ে উঠলেন—'তোমরা ঘরে গিয়ে কথা বলো। আমার অনেক কাজ বাকী। আমি যাই।'

মা চলে গেলেন। উৎপলা ডাকলো—'এসো।'

গুটি গুটি পায়ে ভেতরে ঢুকলো রমেন। উৎপলা পাটী পেতে দিল। বসলো রমেন।

চুপচাপ। দু'জনেই চুপ। আয়নার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে চলেছে উৎপলা। আর বসে বসে দাঁত দিয়ে নখের আঙ্গুল খুঁটছে

রমেন। কখনও বা বিরক্ত হয়ে হাত বুলোচ্ছে চুলে নইলে মুখ মুছছে রুমাল দিয়ে।

ভেজা চুলগুলো সারা পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে উৎপলাই স্তব্ধতা ভাঙলো প্রথম—'ওকি, চুপ করে রইলে যে। কথা বলো।'

'কি বলবো।' অনেক পরে কথা বলতে পেরে যেন বাঁচলো রমেন। বললো—'প্রিয়নাথকাকা তোমার জন্যে শাড়ী কিনেছেন না।'

'হ্যাঁ। ওই তো ওখানে।' আঙুল দিয়ে দড়িতে ঝোলানো কাপড়ের জঞ্জালটা দেখিয়ে দিল উৎপলা—'কিন্তু তুমি জানলে কি করে।'

'ও'গুলো হাতে নিয়েই উনি আমার অফিসে গিয়েছিলেন। কই, পরলে না তো।

'না।' বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকোলো উৎপলা—'ও'সব পরতে নেই। দোষ।'

'দোষ নয়, কুসংস্কার।' রমেন শুধরে দেয়।

'সে যাই বলো, ও'সব আধুনিকতা আমার ভালো লাগে না।'

'শাড়ী পরতেই তোমার এতো মনের জড়তা আর কতো মেয়ে যে আরও কতো কিছু করে। ভাঙাজীবন আবার গড়ে তোলে। ওরাও হিন্দুই।'

'যারা করে করুক। আমি করব না।' আত্মপ্রতিষ্ঠায় অটল উৎপলা।

'তোমার বাবা কিন্তু অন্য কথা বলেন।'

'জানি, বড়ো বেশী কষ্ট পেয়েছেন বাবা। তাই অনেক কিছুই ভাবছেন, অনেক কিছু করছেন আমার জন্যে কিন্তু তা' ভুল আমি ভাঙবো। বোঝা বা—ধর্ম্ম আছে, শাস্ত্র আছে।'

স্তব্ধ হ'ল রমেন। অসংস্কৃত মেয়েলী মন যুক্তি মানে না, ও জানে।

বড়ো অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আজ। কেমন যেন দ্বিধা আর সঙ্কোচে মাথা তুলতে পারছে না রমেন। অথচ এই ঘরে বসেই একদিন কতো কথা হয়েছে ওদের, কতো হাসি আর গান। আজ যেন মস্তো বড়ো একটা নদী বয়ে গেছে মধ্য দিয়ে। দু'জনকে দুই তীরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো রমেন। উঠে দাঁড়ালো।

'চললে ?'

'হ্যাঁ, দুটো তো বাজলো। আবার অফিসে যেতে হবে।'

'একটু দাঁড়াও রমেনদা।' এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল উৎপলা। ফিরে এসে বলল—'আমার একটা কাজ করে দেবে। এ' কাজ শুধু তোমায় দেওয়া যায়। বাবা নন, মা-ও নন। বলো করবে।

'কি বলো।'

'একটু দাঁড়াও।' আঁচলের চাবিটা হাতে নিয়ে কোণের দিকে এগিয়ে গেল উৎপলা। বাক্স খুললো। কাপড়-চোপড়ের গভীরতায় লুকোনো কি যেন অনেক খুঁজে বের করে আনলো। কাগজের টুকরো।

হাতে নিয়ে বুঝলো রমেন, কাগজ নয়, ফটো। ব্যক্তিত্বদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ। কোন এক পুরুষের অর্ধ আলেখ্য।

'চিনছো।'

রমেন ঘাড় নাড়লো। অনুমানটাই এখানে নিঃসন্দেহে সত্য, একান্ত সত্য।

'এ' ছবিটাই বড়ো ক'রে আঁকিয়ে দিতে হবে রমেনদা। চেনা-শোনা আর্টিষ্ট নেই তোমার ? যত লাগে আমি দেব।'

'দেব।' এক কথায় সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এল রমেন। আর তাকালো না উৎপলার দিকে। কোনদিকে নয়। একেবারে রাস্তায় এসে আবার দেখলো ফটোটা। একটি সুস্বাস্থ্য, একটি বলিষ্ঠ পুরুষ চিত্র। চোখটা জ্বলে উঠলেও নিজেকে সংযত করলো রমেন। পকেটে পুরলো।

সারাদিন এ'দিক ও'দিক ঘুরে বিকেলের দিকে ঘরে ফিরলেন প্রিয়নাথ। বারান্দার এককোণে বসে চালের কাঁকর খুঁজছিলেন বাসন্তী দেবী। ও'ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে উৎপলা। সারারাত কাল জেগেছে ট্রেনে, তাই হয়তো ঘুমোচ্ছে ও'ভাবে। প্রিয়নাথ প্রশ্ন ক'রলেন— 'উৎপলা কোথায়।'

'ঘরে।' ঘরের দিকে ইঙ্গিত করেই নিজের কাজে মন দিলেন বাসন্তী দেবী।

প্রিয়নাথ ঢুকলেন ঘরে। অবাক হলেন। মেঝেতে পাটী ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে উৎপলা। বৈধব্যবসনা।

'উৎপলা।' একটু রূঢ় কণ্ঠেই ডাকলেন প্রিয়নাথ।

'কি বাবা।' ঘুম ভাঙলেও তন্দ্রার আমেজ কাটেনি তখনও। চোখজোড়া ভালো করে রগড়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো উৎপলা। ছোট একটা হাই তুললো।

'পরবার কাপড় নেই তোর?'

'কেন, এই তো পরেছি।' নিজের দিকে তাকিয়ে উৎপলা উত্তর দিল।

'এ' তো ছেলেরা পরে।'

'আমাদেরও পরতে হয় বাবা। শাস্ত্র রয়েছে যে।'

'উনিশ বছোরের মেয়ের আবার শাস্ত্র কিরে?' দড়ি থেকে নতুন একটা কাপড় মেয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন প্রিয়নাথ। হুকুম দিলেন—'নে পর।'

'তা হয় না বাবা। অবুঝ হয়ো না।' মিনতি জানালো উৎপলা।'

'তোরা কি আমায় পাগল করতে চাস?' প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রিয়নাথ। চীৎকার করে ওঠেন—'সব কিছুতেই তো মানা আছে তোদের শাস্ত্রের। কিসে বারণ নেই বলতে পারিস?'

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে শোনে উৎপলা।

প্রিয়নাথ থামেন না এখানেই। এগিয়ে চলেন—'এই বয়সে এ'বেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি তুই আর তোর মা তোরই সামনে ঘুরেফিরে বেড়াবে জীবনের পূর্ণতা নিয়ে, সেও আমাকে দেখতে হবে। আমায় তুই শাস্তি দিতে চাস্?'

'স্ট্যপ্।' আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট চাপলো উৎপলা—'তুমি কি পাগল হলে বাবা। মা শুনবেন যে।'

'শুনুক না। সত্যি কথা বলছি আমি, মিথ্যে তো নয়।'

'আঃ। তুমি চুপ করো বাবা।' ছুটে এসে প্রিয়নাথের মুখ চেপে ধরে উৎপলা।

'চুপ করব? বেশ, তবে শাড়ী পর। গয়না পর। হার, চুড়ি, আংটি সব দেবো। সব পরতে হবে তোকে।'

বাবাকে ছেড়ে দিয়ে আবার মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলো উৎপলা।

'কি চুপ করলি যে।' প্রিয়নাথের কপাল আবার কুঞ্চিত হয়—'তবে থাক্। আমাকে মরতে দে তোরা। এ' বুড়োর শ্রাদ্ধ করে তোরা মায়ে-ঝিয়ে শাস্ত্র মানিস। কেউ কিছু বলবে না, কেউ বাধা দেবে না।' চীৎকার করতে করতেই বেরিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ।

পেছন থেকে ডাকলো উৎপলা কিন্তু প্রিয়নাথ শুনলেন না।

ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো উৎপলা। বাসন্তী দেবী আপন মনে কাজ করে চলেছেন। নীরবে, নিঃশব্দে। দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ও। অনেক ভাবলো, অনেক কথা গুনগুনোলো আপন মনে। পাপ, অধর্ম্ম, বাবা।

মাকে না জানিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার। পাটীর ওপর ছড়িয়ে আছে বাবার কেনা নতুন শাড়ীখানা। ফুলপাড়, গাঢ় লাল জমীন। কি যেন মনে হলো হঠাৎ। কাঁধ থেকে আঁচলটা খুলে ফেললো উৎপলা। শুচি বৈধব্যের আবরণ খুলে ফেললো সমস্ত শরীর থেকে। সাদা সায়া আর ব্লাউজের ওপরই জড়িয়ে দিল রঙ্গীন শাড়ীখানা।

নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হলো। ক্ষতি? কিই বা ক্ষতি হবে এতে? কতোটুকু ক্ষতি। কিন্তু বাবা খুসী হবেন। তৃপ্ত হবেন।

প্রিয়নাথই শুধু নয়, এ' রূপান্তর দেখে সকলেই খুসী হলো। রজনীগন্ধা রক্তগোলাপ আজ। দু'দিন পরে রমেন এলো। বললো—'হার মানলে তো।'

লজ্জায় কথা আটকে গেল উৎপলার। বললো—'মন কি চেয়েছিলো? বাবার জন্যেই বাধ্য হ'লাম।'

হাসলো রমেন—'আমি জানতাম, তুমি তোমার শপথ ভাঙবেই। এ'বয়সের কোন মেয়েই পারেনি অমন জীবন বইতে।'

কথা ঘোরাতে চাইলো উৎপলা। বললো—'বোস, চা নিয়ে আসছি।'

উৎপলা বেরিয়ে গেল। ফিরলো বেশ একটু পরে। নিজহাতে

চা করলো, আনুসঙ্গিকের ব্যবস্থাও করলো একটু। তারপর ফিরলো।

অনেক কথার পরে কাজের কথা পাড়লো রমেন—'তোমার ও'টা হলো না।'

'হলো না?'

'না।' চায়ের কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে উৎপলার দিকে তাকালো রমেন—'প্রথমতঃ ওরা অনেক টাকা চায়। একজন আর্টিষ্ট বললেন—রঙীন পোট্রেট দুশো, আর এক রংয়ে দেড় শো থেকে পৌনে দুশো। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। এর চেয়ে বেশী নামলেন না কেউ।'

হতাশ হলো উৎপলা—'দুশো! সে যে অনেক টাকা রমেনদা। সোনার যা কিছু ছিলো সবই তো রেখে এসেছি ওদের কাছে। ওদের জিনিস ওদেরই থাক। কিন্তু...'সত্যি বড়ো ভাবনায় পড়লো উৎপলা।

একটুকরো লুচি মুখে পুরে চায়ের কাপটা আবার মুখে তুললো রমেন। নির্ব্বিকার ওর মন।

'আচ্ছা রমেনদা, কুড়ি-পঁচিশ টাকায় কি কিছুই হয় না?'

'হয়।' অত্যন্ত সহজকণ্ঠে উপায় বলে দিলো রমেন—'এ'টাকেই বড়ো করে এনলার্জ করাতে পারো।'

'বেশ, তবে তাই করে দাও। সেই ভালো।'

'আচ্ছা।' নিঃশেষিত চায়ের কাপটা মেঝেতে রেখে উঠে দাঁড়ালো রমেন—'আজ তবে যাই।'

'এসো।' দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই রমেনকে আবার ডাকলো উৎপলা। কাছে এসে বললো—'যাই করো, মা-বাবাকে জানিও না কিন্তু।'

'আচ্ছা।' রমেন আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে এলো।

রেভারেণ্ড পি, আর, চৌধুরীর বন্ধু প্রিয়নাথ সান্যাল। একমাত্র সন্তান উৎপলার জন্যে অনায়াসে পাগল হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু হননি। না হওয়ার কারণ তার চোখের স্বপ্ন। নতুন ক'রে তিনি গড়বেন মেয়েকে, শেখাবেন—আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া জীবনের ধর্ম্ম নয়।

কোন এক রবিবারের দুপুর। খেতে বসে মেয়েকে ডাকলেন প্রিয়নাথ—'উৎপলা শোন।'

দরজার ও'ধারে দেয়ালের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো উৎপলা—'আমায় ডাকছো?'

'ভেতরে আয়।' খেতে খেতেই প্রিয়নাথ আবার ডাকলেন।

'আমি তো ভেতরে যাব না বাবা।'

'কেন?'

'ও' যে মাছের ঘর। আমার যেতে নেই।'

'তা'তে কি, মাছ তো নেই। আয়, আয় কিচ্ছু হবে না।'

মা আর মেয়ে আবার তাকালো দু'জন দু'জনের দিকে।

প্রিয়নাথ বললেন—'পাপ পুণ্যের প্রশ্ন যদি তুলিস তবে সে দায়িত্ব আমি নেব। বিষ যে খায় তার দোষ নেই, যে খাওয়ায় অপরাধী সে।'

'কিন্তু দোষ না হলেও মৃত্যু কিন্তু আমারই হবে বাবা।'

'এ' তোর মৃত্যু নয়, নতুন জন্ম।' প্রিয়নাথ হাসলেন—'আয় মা, আয়।

অবুঝ শিশুর মতো প্রিয়নাথের এ' একগুঁয়েমী। বিরোধীতা করতে গিয়েও বারবার হার মানতে হয়। তবু ক্ষীণ প্রতিরোধ—'থাক, এতখানি না হয় নাই বা এগোলাম বাবা।'

'উঁহু।' রেভারেণ্ড চৌধুরীর বন্ধু প্রিয়নাথ অ'তো সহজে ভুলবেন

না। বললেন—'আসতে যদি এতই বাধা থাকে তবে থাক্, আমরাই যাব তোর কাছে। সারাজীবন হবিষ্যি খেয়েই কাটাবো।'

মায়ের দিকে তাকালো উৎপলা। বাসন্তী দেবী কথা বলবেন না আর। স্বামীকে বড়ো ভয় করেন তিনি।

'কি হলো, চুপ করে রইলি যে।'

ভীরু কপোতীর মতো চোখ তুলে তাকালো উৎপলা। যেন প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু কোন কথা শুনবেন না প্রিয়নাথ। বললেন—'আজ থেকে তোকে এখানেই খেতে হবে। আমাদের সঙ্গে।'

তবু চুপ উৎপলা। পায়ের নখের ওপর চোখের দৃষ্টি আছড়ে পড়ে। শেষবারের মতো ডাকলেন প্রিয়নাথ—'আয় বলছি।'

আরও একট সাহস খুঁজতে চাইলো উৎপলা। কিন্তু পেলো না। কঠিনপুরুষ প্রিয়নাথের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নোয়াতে হলো। খুব ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলো উৎপলা। পা গুনে গুনে। বাবার পাশে এসে বসলো। প্রিয়নাথ হাসলেন। আনন্দের হাসি, জয়ের হাসি।

•

সন্ধ্যার দিকে রমেন এলো একদিন। বাঁধানো ছবি কাগজে জড়িয়ে। বারবার পড়া দৈনিকটার ওপরেই আবার চোখ বুলোচ্ছিলেন প্রিয়নাথ। ঘোলাটে চশমার ফাঁকে একবার রমেনকে দেখলেন। হেসে অভ্যর্থনা জানালেন—'এসো, এসো বাবা।'

'ভালো আছেন?' সেই স্বভাবজাত প্রশ্ন রমেনের।

'হ্যাঁ বাবা।' হাতের কাগজটা গুটোলেন প্রিয়নাথ। চশমাটা নামালেন চোখ থেকে—'ওটা কি তোমার হাতে?'

'ও কিছু না, কিছু না।' একগাল হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলো রমেন। বললো—'উৎপলা কোথায়।'

'ঘরে।' পাশের ঘরের ভেজানো দরজার দিকে চোখের ইসারা করলেন প্রিয়নাথ।

'ও, আসছি।' একটু সলজ্জ হাসি হেসে ভেতরে ঢুকলো রমেন।

লক্ষ্মীর আসনের সামনে বসে সান্ধ্য দীপারতির আয়োজন করছিলো উৎপলা। চুপিচুপি পেছনে এসে দাঁড়ালো রমেন। ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলো —'ব্যস্ত আছো?'

চমকে পেছনে তাকালো উৎপলা। তারপরই শান্ত হাসির ঢেউ ভাসালো ঠোঁটে—'বাব্বা, কি ভয় পেয়েছিলাম। অমন করতে আছে?'

'এই নাও তোমার আরাধ্য বস্তু।' কাগজে মোড়া ফটোটা এগিয়ে দিলো রমেন।

ঠোঁটের হাসি শুকিয়ে গেল। ব্যস্তহাতে কাগজের ভাঁজ খুললো উৎপলা। তারপর তাকিয়ে রইলো। স্থিরদৃষ্টি, অপলক চোখ। সেই তাকিয়ে থাকা চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো রমেন। অনেকক্ষণ। মুগ্ধ হয়ে পড়েছে উৎপলা। বারবার দেখা এই মুখ, এই ফটো আজ যেন কোনদিন না দেখার মতো নতুন।

কেমন যেন বিব্রত বোধ করলো রমেন। আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে পিছিয়ে এলো। দরজার কাছে এসে আবার তাকালো। উৎপলা তেমনি স্থির, স্তব্ধ। খুব ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করলো রমেন।

'এই যে বাবা। বসো।'

প্রিয়নাথের ডাকে চমক ভাঙলো রমেনের। বললো—'না কাকাবাবু, আজ আর সময় নেই আমার। আমি যাই। আবার আসবো একদিন।' কোন কথা আর শুনলো না রমেন। ছিটকে বেরিয়ে এলো।

প্রিয়নাথ হাসলেন। রমেনের এ' অন্যমনস্কতায় ভয় পেলেন না তিনি। মান-অভিমানের পালাতেই এ'বয়সের ভালোবাসা। তিনি

বলেন। এ' বয়স, এ' মন তাঁরও একদিন ছিলো। কাগজ গুটিয়ে উঠে পড়লেন প্রিয়নাথ। আজ তাঁর বড়ো আনন্দের দিন, বড়ো শুভমুহূর্ত।

রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বাসন্তী দেবী। হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকলেন প্রিয়নাথ—'শুনছো।'

কি।' বাসন্তী দেবীর প্রশ্নে কোন ঔৎসুক্য নেই।

এক গাল হেসে স্ত্রীর আরও কাছে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। বললেন—কি, যা বলেছিলাম ঠিক হ'ল কিনা?'

'বেশ তো, কি হ'ল বলবে তো।' স্বামীর রসকথায় এতটুকু যেন রস পেলেন না বাসন্তী দেবী।

'রমেন এসেছিলো।' একটা কাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলেন প্রিয়নাথ—'কি যেন হাতে নিয়ে এসেছিলো। উৎপলাকে দিয়ে গেলো! যাবার সময় অবশ্য একটু কেমন যেন ভার ভার দেখালো রমেনের মুখ। তা, এ'বয়সে এমন হয়েই থাকে একটু-আধটু। হ'বেও।'

'তুমি সে'কথা বলেছিলে রমেনকে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কি বললো।' ডালের কড়াইয়ে হাতা নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করলেন বাসন্তী দেবী।

'তোমারই মতো ও-ও বললো, উৎপলা রাজী হবে না। ওকে বুঝিয়ে বললাম, রাজী হবেই উৎপলা। ওকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমার।'

'তারপর রমেন কি বললো।'

'বললো—ওর কোন অমত নেই। ও রাজী।' খুসীর আমেজে একগাল হেসে প্রিয়নাথ বললেন—'একরকম ভালোই হলো। কি বলো। সেদিন এই রমেনকেই যে জন্যে বাধা দিয়েছিলাম আজ সেইটেই আমাদের বড়ো সুবিধে। ওর বাপ নেই, মা নেই, কেউ নেই।

এ' [illegible] ব্যাপারে অমত করবার কেউ নেই। যারা আছেন রমেন তাদের মানে না।'

'তবে তুমি কি মনে করো উৎপলা রাজী হবে।' আবার সেই পুরোণো প্রশ্ন বাসন্তী দেবীর।

'হবে না মানে? নিশ্চয়ই হবে।' বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুসি মেরে বললেন প্রিয়নাথ—'ধরো, তুমি আগুনে পুড়ছো। তোমায় যদি বাঁচাতে চাই তবে তুমি বাঁচতে চাইবে না, বেরিয়ে আসবে না আগুন থেকে?'

এ' যুক্তি অকাট্য। চুপ করলেন বাসন্তী দেবী।

'তাছাড়া দেখছো না? শাড়ী পরলো উৎপলা, এ'ঘরের রান্নাও খেলো। সবই মেনে নিলো আর এ'টা মানবে না? মানবে, মানবে, নিশ্চয়ই মানবে।'

হ্যাঁ, এ'সব চোখের ওপর দেখেছেন বাসন্তী দেবী। প্রতিক্ষেত্রে স্বামীর জয় আর মেয়ের আত্মসমর্পণ। তাই তিনিও আজকাল বিশ্বাস করেন—রাজী হয় তো হবে উৎপলা। জীবন গড়ার স্বপ্ন কার না থাকে? ভোগ-বিলাসের সাধ তো থাকবেই এ' উনিশের যৌবনে।

বাসন্তী দেবী স্বামীর দিকে তাকালেন—'তাহলে কি করবে এখন?'

'হ্যাঁ, একটা কথা।' মুখটা আরও একটু এগিয়ে এনে স্ত্রীর কানে ফিসফিসিয়ে বললেন প্রিয়নাথ—'সে ভার তোমার, তুমি ওর মত নেবে।'

'আমি?' তপ্ত কড়াই নামাতে গিয়ে থমকে গেলেন বাসন্তী দেবী।

'হ্যাঁ, তুমি।' স্ত্রীকে সাহস দিলেন প্রিয়নাথ—'ঘুমোবার আগে তুমি শুধু কথাটা পাড়বে। বাকীটুকু কাল সকালে আমিই বলবো।'

'আজই বলতে হবে?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।' হাসতে হাসতে প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ালেন।

রাত তখন অনেক নয়। সব কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকলেন বাসন্তী দেবী। বালিসে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে উৎপলা। প্রিয়নাথ অন্য ঘরে। দরজার খিল এঁটে মেয়ের দিকে এগিয়ে এলেন। নীল শাড়ী জড়ানো মেয়েকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন দু'চোখ ভরে। সাহস কুড়োলেন।

'উৎপলা।' ধীরে ধীরে মেয়ের পাশে বসলেন বাসন্তী দেবী। চুলে হাত রাখলেন।

—'তোকে একটা কথা বলব মা। শোন্।'

হঠাৎ ঝামটা মেরে উঠে বসল উৎপলা। মায়ের মুখোমুখী কঠিন হয়ে বললো—'তোমরা কি আমায় পাগল করতে চাও মা? তোমরা কি চাও সেকি কিছুই বুঝিনে আমি।'

ভয় পেলেন বাসন্তী দেবী। এ'জন্যে তিনি তৈরী ছিলেন না—'কেন মা, কি বলছিস্ তুই।'

'তুমি না মা। তুমি কি কোনদিন ভালো করে তাকাও নি আমার দিকে? মেয়ে হয়েও বোঝোনি কিছু?'

চমকে উঠলেন বাসন্তী দেবী। সূক্ষ্মচোখে মেয়ের ওপর একপলক চোখ বুলিয়েই তিনি সব বুঝলেন। আশ্চর্য্য। এতদিন তিনি লক্ষ্যই করেননি যেন।

লজ্জায় মাথাটা আরও নোয়ালো উৎপলা। চাপা গলায় বললো—'উনি তো গেলেন কিন্তু যাকে রেখে গেলেন ওর জন্যেও তো আমায় বাঁচতে হবে মা।'

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নোয়ালেন বাসন্তী দেবী।
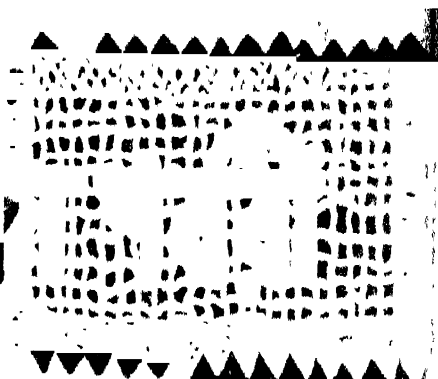
উলু-লু-লু-লু……

উলুধ্বনি ! থমকে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। ব্যস্তপায়ে ছুটে যাচ্ছিলেন পাইনার হাটের দিকে। ন'টার আগেই দেখা করতে হবে সমসের মিঞার সঙ্গে। বেলাও তখন গড়িয়েছে অনেক। কিন্তু একটি পাও এগোতে পারলেন না আর। বিশ্বাসই করতে পারলেন না—সত্যি এ উলুকাকলী। হিন্দুনারীর পবিত্র কণ্ঠশঙ্খ। কি জানি কেন, ফজরের আজানের মতো ভালো লাগলো এ কণ্ঠবীণা। এর স্নিগ্ধতা, এর তরঙ্গায়িত অনুরণন।

না, স্বপ্ন নয়। চকিতে দিক নির্ণয় করলেন এ'দিক ও'দিক তাকিয়ে। আরে, এ যে দক্ষিণ পাড়া। তবে কি ভট্টাচার্যের ঘরে ? গোটা বাঘের গ্রামে এখন ওই তো একমাত্র ঘর। আর যে ক'ঘর এখনও রয়েছে তা শুদ্দুর পাড়ায়। হাতে গোনা যায়।

জোর কদমে এগিয়ে এলেন আতাউল্লা। একেবারে ভট্টাচার্যের উঠোনে—'কই ভট্টাইজ, গেলা কই। শোন দেখি একবার।'

আহ্নিক শেষ করে সবে আসন গুটোচ্ছিলেন ভট্টাচার্য, আর এমনি সময়ে আচম্‌কা হাঁক এলো বাইরে থেকে। সব ফেলে ভট্টাচার্য ছুটে এলেন। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আতাউল্লাকে—'তুমি দাদু হইছ মিঞাসাহেব। নাতি হইছে তোমার।'

'সত্যি ?'—আতাউল্লাও খুব খুশি। কাঁচাপাকা দাড়ির ঝোপে ঝকমকিয়ে উঠলো হাসপালকের মতো সাদা একপাটি দাঁত—'তাই বুঝি বউঠানের অতো গলাঝাজানী। হেই শুইনাই তো আইলাম।'

'হ। কইলকাতা থেইকা চিঠি আইছে এই একটু আগে। রমেন লেখছে—গত বুধবার রমেনের একটা ছেইলা হইছে। ভালোই আছে বৌমা।'

'বাঃ বাঃ।' আতাউল্লাও উল্লসিত—'আমাগো খাওয়াও। একা একা ফুর্তি করবা আর আমরা বুঝি তাই দেখুম, না।'

'কি আর খাওয়ামু মিঞাসাহেব, হেই দিন কি আর আছে।' হঠাৎ বড়ো বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন ভট্টাচার্য—'শুধু দুইটা বাতাসা আর এক গেলাস জলই পারি দিতে। তার বেশি কি দিমু কও।'

মুখ থেকে হঠাৎ খসে পড়া কথাটা যে এমনভাবে এ'মধু আলাপের সব রস নিংড়ে নেবে তা বুঝতে পারেননি আতাউল্লা। কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন—'তাই খামু। খাওনটা কি বড়ো কথা ভট্টাইজ। রমেন তোমার ছেইলা, আমাগো কেউ না ? অর ছেইলা হইছে—হেই খাওয়া নিমু অর কাছ থেইকা। ও দেশ-গ্রামে ফিরুক।'

'হ।' ভট্টাচার্য দীর্ঘশ্বাস টানলেন—'অরা আর ফিরছে। হেই আশাও তুমি কর মিঞাসাহেব।'

'কি কইলা ভট্টাইজ ?' আতাউল্লা কঠিন হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঁচকোলেন—'কি কইলা, দেশের ছেইলা দেশে ফিরব না। কি জানি তোমাগো ওই সংস্কৃত ভাষায় কয়—জননী জন্মভূমিশ্চ···মানে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের থেইকাও বড়ো। রমেন যদি অর মায়েরে খুন করনের মতো বেইমান হয় তবেই দেশরে ভুলতে পারবো। নেইলে একদিন না একদিন ফিরবই। ফিরতেই হইব।'

'তোমার কথাই যেন সত্য হয় মিঞাসাহেব।'

'হইব, হইব।' ভট্টাচার্যের কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন আতাউল্লা—'দেইখো, তামাম্ দুনিয়াটাই মস্ত বড একটা ঘোরপ্যাচ খাইয়া আবার ঠিক হইয়া যাইব। সব আগের মতন হইব।'

'আসো মিঞাসাহেব, বস।' প্রসঙ্গটা পাল্টে দিতে চাইলেন ভট্টাচার্য। এ'সব সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা উঠলে তার বুকের ভেতর দুঃখের বাসুকি নড়ে-চড়ে ওঠে। বলেন—'একটু জল খাইয়া যাও মিঞাসাহেব। আসো।' হাত ধরে টানেন ভট্টাচার্য। মিনতি জানান।

'খামু ভট্টাইজ খামু।' আতাউল্লা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলেন—'দেখছ বেলা কেমন চইড়া গেছে। যামু আবার হাটে। তবে বৌঠানরে কইও—এই কাত্তিকে রেহাই দিমু না। পেট ভইরা পিঠা খাইয়া যামু। না ডাকলেও নিজে আইযা জানানী দিয়া যামু।' বলেই হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়ালেন আতাউল্লা—'আমি যাই ভট্টাইজ। পরে আবার আমুম।'

আতাউল্লা বেরিয়ে এলেন। আবার হাটের পথ।

পাশাপাশি গ্রাম। বাঘের আর গৈস্তা। একই ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় লেখা দু'গাঁয়ের নাম। অবশ্য বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে প্রস্তাব করেছিলেন আতাউল্লা—এক করো এ' দুটো গ্রাম। নজির দেখিয়েছিলেন—বত্রিশ বছোর আগেও এমন ছিলো না। এ' তাঁর নিজের চোখে দেখা—বাঘের গ্রাম ধীরে ধীরে ভাগ হয়ে গেলো। সেদিনও সুলতানী মসজিদের সামনে ঢালা ঘাসের জাজিমে বসে এ' কথা অস্বীকার করতে পারেননি কেউ। সেদিনের সভায় তাঁকে মিলিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দু'গাঁয়ের মোড়লেরা—নামে কি যায় আসে, মনে

মনে আমরা সবাই একই গাঁয়ের লোক। একই হাটে বাজার করি, একই ডাকঘরে টিকিট কিনি। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। আমরা ভাই ভাই।

বিচ্ছিন্ন একটি পুষ্প হাতে নিয়ে একদিন গাছটাকে বড়ো ফাঁকা মনে হয়েছিলো তাই সে'টাকে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন আতাউল্লা। একদিন শুধু ফুল নয়, সুপুষ্ট শাখায় আঘাত ঘনিয়ে এলো। ডাক এলো সুদূর লাহোর করাচী থেকে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। নতুন দুনিয়া—ইদের চাঁদের নিচে। মসজিদের সুশুভ্র গম্বুজে পিছলে যাবে জ্যোৎস্না। কিন্তু সেইসঙ্গে মন্দিরশীর্ষেও উজ্জ্বল থাকবে 'অউম্', দীপারতি হবে কাঁসর ঘণ্টায়, মঙ্গলশঙ্খ বাজবে প্রত্যহ। এস্বপ্ন ছিলো আতাউল্লার চোখে। যদিও সবার ওপর সত্য হয়ে থাকবে ইসলামের বৈজয়ন্তী। পঁচিশ বৎসরের স্কুল মাষ্টারী-করা মগজ যেন অবশ হয়ে পড়েছিলো তার—কুতুবমিনার, ময়ূরসিংহাসন, জুম্মা আর মতি মসজিদ—ভাবতে ভাবতে সেদিন উতলা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মন তার নড়ে উঠেছিলো। মুক্তিমন্ত্রের শপথ নিয়ে তাই ঝাপিয়ে পড়লেন আতাউল্লা। গ্রামে গ্রামে গড়ে তুললেন মুসলীম লীগ।

সাম্প্রদায়িক কলুষ থেকে সদামুক্ত মন আতাউল্লার। এই ধারণাই এতদিন ছিলো সকলের। কিন্তু আকস্মিক এ' পরিবর্তনে বিস্মিত হলো বাঘের গ্রাম। শঙ্কিত হলো।

'একি মিঞাসাহেব! শেষে তুমিও এইসব কইতে শুরু করলা।' একদিন তারা দল বেধে আক্রমণও করেছিলো আতাউল্লাকে—'তুমি না কও হিন্দুগো কেত্তন শুনতে খুব ভালো লাগে তোমার।'

আতাউল্লা শান্ত হেসে বলেছিলেন—'লাগেই তো।'

'তা তো লাগে।' এই সব শুনলে হিন্দুগো মনে ভয়-ডর লাগে না।'

'ভয়!' আতাউল্লা চমকে উঠেছিলেন—'কিসের ভয়?'

'মুসলমানের রাজত্বি হইলে আমরা বাঁচুম ভাবছো। আমাগো মান-সম্মান কিছু থাকবো।'

'ক্যান থাকবো না।' এ'বার রুখে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। 'তোমরা জ্ঞানীগুণী লোক হইয়া কও কি এই সব। মুসলমানের রাজত্বি কি ভারতবর্ষে নতুন নাকি আইজ। পাঠান-মোগলেরা এইদেশে রাজা আছিলো না? না সেইদিন হিন্দু আছিলো না হিন্দুস্থানে।'

'আছিলো, কিন্তু জিজিয়া করের কথাটা ভুইলা যাও ক্যান!'

'আরে, সেই তো আউরেঙ্গজেবের আমলে। আকবরের কথাডাও মনে রাইখো একবার। আমাগো রাজ্যি তৈমুর-নাদির শার রাজত্বি হইবো না, হইবো শাহানশা'র রাজত্বি। কংগ্রেস যদি রামরাজ্য গড়ে তো আমরা আকবর রাজ্য গড়ুম। রামরাজ্যে মুসলমান থাকবো হেই বিশ্বাস আমার আছে, আমাগো রাজ্যে হিন্দু থাকবো হেইও আমি হলপ কইরা কইতে পারি।'

জীবনে একবার যাকে সত্য বলে জেনেছেন আতাউল্লা, তা থেকে তাঁকে টেনে আনা সহজসাধ্য নয়। জাগ্রত ইতিহাস। কেন, এমন ঘটনা কি নতুন নাকি আজ? ভারতবর্ষের কোল থেকে ছুটে যায়নি ব্রহ্মদেশ? বিচ্ছিন্ন হয়নি সিংহল?

তারপর থেকে বহুদিন হিন্দু ভাইদের ঘরে ঘরে ঘুরেছেন আতাউল্লা। নানা ভাবে বুঝিয়েছেন তাদের, নানা সান্ত্বনা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন বারবার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভাঙ্গামন নিয়ে ঘরে ফিরছেন তিনি! প্রতিদিনই ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে তাঁর উদ্যম, উদ্দীপনা। ধ্বসে পড়তে চাইছে তাঁর স্বপ্ন-সৌধ। যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি তার বিরাট একটা অংশই যেন ডুবে যেতে

চাইছে সাগর অতলে। কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে হয় তাঁকে। মকরেব। চোখে পড়ে কোরাণ শরীফ। প্রেরণা জাগে, সঞ্জীবিত হয় মন। না, না, পথ চলো মুসাফির, এগোও—তোমার পায়ের ছাপ পড়ার আগেই পথের ধুলো উড়িয়ে নেবে আসমানী হাওয়া। বেহেস্তে আল্লা আছেন, সত্য আছে আসমানে। ইমান রেখে কাজ করো, ক্লান্ত হয়ে কবরে শয্যা নাও। খোদার অকৃপণ হাত, ধর্ম যদি ঠিক থাকে মেহেরবানী জুটবেই।

কিন্তু সংগ্রাম যেদিন শুরু হলো সেদিন সত্যই বিচলিত হলেন তিনি। আগস্টের ষোল তারিখ, উনিশ-শো ছেচল্লিস। আর সব গ্রামবাসীর মতো নিরক্ষর তো তিনি নন্। বাণীমন্দির পাঠাগারের প্রাত্যহিক দৈনিকে রোজই তিনি চোখ বুলোন। এ' সংগ্রামের স্বরূপ তার চোখে দু'দিনেই ধরা পড়ে গেল। আর নয়, সভ্যতার বোরখা খুলে গেছে। সব ফাঁকি। দাবাগ্নি জ্বলেছে আসমুদ্রহিমাচলে। সারা ভারতের হাহাকার যেন শুনতে পাচ্ছেন আতাউল্লা। কোটি কোটি মানুষের কাতর বিলাপ। ভাবতে ভাবতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন আতাউল্লা—যবন-কাফেরে লড়াই, মন্দির-মসজিদের দ্বন্দ্ব। এরই জন্যে কি এত তাঁর শ্রম? এরই জন্যে সংগ্রাম?

আর হিন্দু ভাইদের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না তিনি। খোদার কসম দিয়ে একদিন যে কথা সোচ্চারে বলেছিলেন তিনি আজ এ' সংগ্রাম তাঁকে মিথ্যাবাদী করেছে। খোলা মাঠে, রাত দুপুরে ছাউনি পড়ে হিন্দু বাড়ির উঠোনে। লাঠি, সড়কি, ছুরি আর জ্বলন্ত মশাল নিয়ে হিন্দু-যুবকেরা রাত ভোর করে। বর্ষাকাল। জলে ভরে গেছে মাঠ ঘাট। নৌকোয় নৌকোয়, ডিঙিতে ডিঙিতে তারা পাহাড়া দেয় সারা রাত। ঘুম নেই মেয়েদের চোখে, শিশুদের কান্নাও চাপা পড়ে যায় মায়েদের

কান্নায়। কিন্তু আকাশে তো শাশ্বত চাঁদ, নক্ষত্র প্রশান্তি। শঙ্কা নেই, ভাবনা নেই, চিরদিনের সেই মায়াবী আকাশ। কিন্তু কী হয়েছে এ' পৃথিবী। খোদাতাল্লার গুলবাগ! আগুন—শুধু আগুন চারদিকে। মৃত্যু—শুধু মৃত্যু! 'আল্লাহো আকবর'—বহু দূরের প্রান্তসীমা থেকে যদি ভেসে আসে কোন চীৎকার তবে সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি ওঠে—'বন্দেমাতরম্'। কাঁসর বেজে ওঠে ঘরে ঘরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভেসে যায় সাবধান সঙ্কেত। দু' হাতে কান চেপে ধ'রে দাপাদাপি করেন আতাউল্লা জবাই করা মুরগীর মতো—না, না, পবিত্র আল্লার জয়ধ্বনি এ' নয়—এ' চেঙ্গিস খাঁর উল্লাস।

দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো নোয়াখালী, সঙ্গে সঙ্গে বিহার। বম্বে, কলকাতা, লাহোর, করাচী। সর্বত্র। সব দেখে, সব শুনে বেঁচে থাকার শেষ সাধটুকুও একেবারে নিভে গেলো তাঁর। এ'বার মৃত্যু, শেষ হোক এ' জীবন। কিন্তু কোথায় মরণ। আত্মহত্যা পাপ। নইলে তখনও হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন তিনি। জানিয়েছেন—এ'বারে তাকে হত্যা করুক কেউ। চিরজীবনের ঋণ তিনি রেখে যাবেন তার কাছে। কিন্তু হিন্দুরা হেসে মোড়া এগিয়ে দিয়েছে—'আরে, বস মিঞা, বস। তুমি কি পাগল হইলা নাকি?'

নিজহাতে কবর সাজালেন আতাউল্লা কিন্তু মৃত্যু এলো না।

এলো না, ভালোই হলো।

পরদেশী চলে গেলো দেশ ছেড়ে। এলো নতুন দিন। যে ভাবেই আসুক, আসার পথে যত ভুলচুকই হোক, সবশেষে যা এলো সেটাই হাজার হাজার জনতার আরাধ্য সামগ্রী। মোবারকের দিনে চাঁদের প্রতীক্ষায় বসে থাকার মতো গভীর উৎকণ্ঠায় এতদিন দিন গুনেছে

তারা। আতাউল্লাও আবার জেগে উঠলেন। এ'বার তিনি বাঁচবেন। পঞ্চাশোত্তীর্ণ পুরুষ—কিন্তু অসীম তারুণ্যে হৃদয় মন আবার গড়ে উঠলো তাঁর।

সকলের আগে আতাউল্লা ছুটলেন হিন্দু ভাইদের কাছে। অতীতে যা ঘটেছে তা' অতীতের কথা, সে ইতিহাস। এবার গড়ে তোলো তোমার পৃথিবী, তোমার ঘর। বিশ্বাস করো—খোদার কসম। এতবড়ো দাঙ্গা হাঙ্গামা রাহাজানী হয়ে গেলো দেশময় কিন্তু একটা প্রাণও তো যায়নি বাঘের গ্রামের। নিজেদের ঘর আগলে বসে থাকার মতো মুসলমানরা রক্ষা করেছে তাদের হিন্দু ভাইদের। এ' যদি সত্যি হয় তবে এ'ও সত্যি, আজও কোন অসুবিধা হবে না তোমাদের। আল্লার নামে, ধর্মের নামে প্রতিশ্রুতি দিলেন আতাউল্লা।

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি এ'কথা। হিন্দুরা বাক্স বাঁধলো। কেউ কেউ জলের দরে ঘরও দিলো বিক্রী ক'রে। যাদের অনেক জমি—কিছু কিছু ধানভরা ক্ষেতও তারা ছেড়ে দিলো। বাধা দিয়েছেন আতাউল্লা, মিনতি জানিয়েছেন, হাত ধ'রে কেঁদেছেন। কিন্তু ব্যর্থ সে প্রয়াস। আতাউল্লার চোখের সামনেই বাঘের গ্রাম ভেঙেচুরে গেলো।

ভদ্রলোকেরা দাঙ্গার সময়েই অনেকে দেশ ছেড়েছেন। যারা ছিলেন তারাও এবার পাড়ি দিলেন। সেইসঙ্গে সঙ্গ নিলো চাষী, জেলে, তাঁতী, শূদ্র, ডোম। ঢাকা শহরের দিকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে তারই পাশে তখন একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে রোজ। স্তব্ধ, গম্ভীর এক পাষাণ পুরুষ। শোভাযাত্রা চলেছে। পঞ্চাশ সালে এমন মিছিল দেখেছিলো এ'-দেশের মানুষ। তারপর আজ। কিন্তু এ'যেন আরও ভয়াবহ, বীভৎস। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষগুলো আজ যেন আরও শঙ্কিত। অনিশ্চিত উদ্দেশ্যে এ'যাত্রা তাদের।

নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রদবদল হলো। বাঘের, সৈন্তা আর পাঁচটা ভিনগ্রামের ইতিহাসে নতুন এক বিস্ময় সৃষ্টি হলো— দীর্ঘ পাঁচ বছোর পরে সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি আতাউল্লা।

কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। ভট্টাচার্য গিন্নীর উলুধ্বনি শুনে এসেছেন তিনি। মনটা খুশির আবেগে ভরপুর। কিন্তু বড় খালটা যে বাঁকে পাইনার খালের সঙ্গে এসে মিশেছে সেখানে এসে আরও কিছু যেন শুনতে চাইলেন তিনি। সামনেই রাধিকা ঘোষের বাড়ি। পাশে ঘোষবাড়ির সাহায্যপুষ্ট দেবালয়। লোকে বলতো—বিষ্টু গোঁসাইর আখড়া। তিন বছর আগেও এ'সময়ে, এই ভরা দুপুরে কাঁসরঘন্টা বাজতো ছন্দের তালে তালে, সংকীর্তন হতো। এ'পথে যেতে আসতে প্রত্যেক হিন্দুই হাত জোর ক'রে কপাল ছুঁতো, দু'হাতে মাটি লেগে নিয়ে বুকে মাখতো।

কিন্তু কোথায় সে'সব দিন। ইতিহাসের কথা।

নইলে দু'বছর আগেও জন্মাষ্টমীর দিনে, ঝুলনপূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর সংকীর্তন হয়েছে এখানে। ক'লকাতা থেকে টাকা পাঠিয়েছে ঘোষেরা, বিষ্টু গোঁসাই সব ঢেলেছেন ধর্মের নামে। দেউড়ীর বাইরে মোড়া পেতে দিয়েছিলেন বিষ্টু গোঁসাই আর আতাউল্লা বসে বসে গান শুনেছেন। ঘর থেকে আনা নিজের হুঁকোয় তামাক টেনেছেন। 'দীন অভাজন আমরা সবাই তোমার চরণতলে।' বাঃ, মিঠে কথা। আতাউল্লার বড় ভালো লেগেছিলো গানটা। খোদার কাছে তাঁরও এই একই মোনাজাত— 'দীন অভাজন আমরা সবাই তোমার চরণতলে।'

একটা দীর্ঘশ্বাসে আতাউল্লার বুক নড়ে উঠলো যেন। আবার

চলতে শুরু করলেন হাটের পথে। এ কি হলো তাঁর? বাঘের গ্রামের ওপর দিয়ে চললে এমন ক'রে কাঁদে কেন তাঁর বুক? পা দু'টো কাঁপে যেন। এই কি তাঁর গ্রাম? এ'গ্রামের পথেই কি একদিন দশ পা হাঁটলে পঁচিশজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। 'কি মিঞাসাহেব; চললা কই?' তারপরই নানা অভাব-অভিযোগের, সুবিধা-অসুবিধার কথা। ধৈর্য ধরে সব কথাই শুনতে হতো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে। জবাবও দিতে হতো। কিন্তু কোথায় তারা আজ।

এ চড়া দুপুরেও ধীরেন সাহাকে পুকুর পাড়ে বসে থাকতে দেখা যেত রোজ। কিছু পাক আর নাই পাক ছিপ ফেলে ফলতার দিকে চেয়ে থাকতো পলক না ফেলে। লোকে বলতো—পাগল। আরেক অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলো কায়েতপাড়ার রমণী ঘোষের—উঠোনে মাদুর পেতে গান ধরতেন রোজ রাতে। ছেলের হাতে তবলা দিয়ে হার্মোনিয়ম টেনে নিতেন নিজে। রাত দশটার আগে কোন দিন ঘরে ঢুকতেন না। এরা পাগল ছিলেন না। এ' গ্রামের প্রাণ ছিলো এঁরা ছিলেন বলেই।

এমনি সময়ে পুকুরঘাটে নেমে আসতো মেয়ে বউরা। স্নানের জন্যে অথবা বাসনের পাঁজা হাতে দিয়ে। সাঁতার কাটতো, দাপাদাপি করতো অল্পবয়সী ছেলে ছোকরার দল। ওপর থেকে ধমক দিতেন গুরুজনেরা। কার বাড়ির গরুটা বিইয়েছে একুশদিন আগে—আজ সন্ধ্যায় তাই উৎসব। মুড়ি মুড়কী আর নাড়ু ছড়ানো হ'বে। কার উঠোনে ভিড়—খোঁজ নিয়ে দেখো—আজ শনিবার। শনি আর সত্যনারায়ণের পুজো। সমস্ত পাড়া তাই ভেঙ্গে পড়েছে এখানে। এ'ছাড়া বারো মাসে তের পার্বণ। পুরনারীদের উলুধ্বনি, কাঁসরঘণ্টা আর মঙ্গলশঙ্খের অনুরণনে বাতাস কাঁপতো রোজ।

সহসা চমকে উঠলেন আতাউল্লা। চলতে চলতে আবার তার পা দুটো স্থির হয়ে যায়। বড় খালের ধার ঘেঁসে বটতলার নিচে হিন্দুদের শ্মশানভিটে। আজকের নয়, আতাউল্লা তার ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন ঐ'শ্মশানের আগুন। যখন আগুন থাকতো না, পড়ে থাকতো মানুষের হাড়, মাথার খুলি, পোড়া কাঠ আর ছাই। যবনেরা যেতে পারতো না কাফেরদের গোরস্থানে কিন্তু বটতলার পেছন থেকে উঁকি মারলেই স্পষ্ট দেখা যেত সব।

এই কি সেই শ্মশান?

কাফেরদের গোরস্থানের দিকে তাকিয়েই জল নেমে এলো যবনের চোখে। নিজের হাতে গড়া পৃথিবীই আজ তাঁকে পরিহাস করছে যেন। রুস্তমের মৃত্যু, সোহ্‌রাবের চোখে জল।

এ কি রূপ হয়েছে পৃথিবীর। বন-শিউলী, ফণীমনসায় ভরে গেছে চতুষ্কোণ মাটিটুকু। ঘন ঝোপঝাড়ে, লতাগুল্মে ছেয়ে গেছে চারদিক। শ্মশানের উপবটুকুই শুধু নয়, সিমেন্ট বাঁধানো পাঁচিলগুলোও ভরে গেছে শেওলায়, আগাছাগুলোও নেমে এসে চারপাশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের পক্ষে দুর্গম সে স্থান, আজ বুঝি সাপের আস্তানা সেটা।

আজ কতদিন? মনে মনে গোনেন আতাউল্লা। চার বছর, পুরো চার বছর হোলো এ' শ্মশানে আগুন জ্বালেনি কেউ। কথাটা মনে হতেই আবার যেন শিউরে উঠলেন তিনি। তবে কি এখানেও সেই এক সত্য—এ' শ্মশানে আগুন জলবে না আর। এ'বনবাদার ঘন হবে, পরিসরে বাড়বে। তারপর যদি পরিষ্কারও কেউ করে কোনদিন তবে এ'শ্মশান বুঝি শ্মশান থাকবে না, ধানের জমি হবে। তিন বছর পরে বুঝি ভুলে যাবে মানুষ আশ্বিন-কার্তিকের কোন এক অমাবস্যার রাতে প্রতি

বছর সাত গাঁয়ের লোক জড়ো হতো এখানে। ঘটা করে পুজো হতো, বাজী পুড়তো, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়ায় মুখর হতো স্তব্ধ রাতের দিগ্বলয়।

আতাউল্লা এগোতে পারলেন না আর। ফিরলেন। থাকগে সামসের মিঞা—দু'দিনে আর পাটের দর কতো নেমে যাবে কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ আছে তাঁর। এখনও দু'চার ঘর হিন্দু রয়েছে গ্রামে। এখনও বুঝি সময় আছে। এখনও বুঝি আগুন জলতে পারে এ'শ্মশানে। আজ শুধু একটি হিন্দুর মৃত্যু চান তিনি!

দ্রুতগতিতে ফিরে চললেন আতাউল্লা। আবার সেই বামুনপাড়ায়। ভট্টাচার্যের উঠোনে পা দিয়েই হাঁক ছাড়লেন আতাউল্লা—'কই ভট্টাইজ্ গেলা কই। শোন দেখি একটু।'

ঘরের দাওয়া নিকোচ্ছিলেন ভট্টাচার্য গিন্নী। ঘোমটা টেনে ছিটকে পড়লেন চোখের পলকে। হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভট্টাচার্য। হাতের হুঁকো বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে পিঁড়িটা পেতে দিলেন। মাটির উপরই নিজে বসলেন। শুধু হুঁকোটাই এগিয়ে দিতে পারলেন না অতিথিকে—'আবার যে আইলা মিঞাসাহেব। এই বুঝি ফিরলা হাট থেইকা।'

'না, হাটে আর গেলাম কই।' আতাউল্লা বসলেন—'আইচ্ছা ভট্টাইজ, তোমাগো হিন্দুরা কি মরে না। এই তিন বছরে তো একটা হিন্দুরেও মরতে দেখলাম না।'

শিউরে উঠলেন ভট্টাচার্য। আতাউল্লার মুখে এ'কথা। একি সেই আতাউল্লা? আজ সকালের সেই মানুষ?—'তুমি, শেষে তুমিও হেই কথা কইতাছ মিঞাসাহেব? তুমিও আমাগো মরণের কথা কও!'

'আরে ভাই।' আতাউল্লা তেমনি স্থির গম্ভীর—'মরণেরে ডরাইতে নাই। আইজ সকালে না ছেইলার চিঠি পাইছ তুমি। তোমার না নাতি হইছে। আরে ভাই, তামান দুনিয়াটাই এমন। একজনের জন্ম হয়, আরেকজন মরে। আর এই জন্মমিত্যু আছে বইলাই না পিথিবীটা আইজও বাইচা আছে। নেইলে কবে ফতুর হইয়া যাইত পিথিবী। আমন ধান তুইলা আইনা আমরা আবার রবিফসল বুনি। ক্ষেত জমিন কি আর খালি পইড়া থাকে ভট্টাইজ্?'

ভট্টাচার্যর চোখে শঙ্কা তখনও। হতভম্ব তিনি। আতাউল্লার এ' হাসিও যেন কেমন মনে হচ্ছে তাঁর—'ওইসব কথা রাখো। পষ্ট কইয়া কও দেখি, কি কইতে চাও তুমি।'

'কমু আর কি?' আতাউল্লা তাঁর দাঁড়ির ঝোপে পাঁচ আঙ্গুলের চিরুণী চালালেন—'বড়খালের ধারে তোমাগো যে বটতলার শ্মশান তার চেহারাটা দেখছ একবার। তোমাগো জিনিস তোমরা না দেখলে কে দেখবো কও দেখি। গাছ-গাছড়া আর সাপখোপে জায়গাটারে কি করছে দেখছো। মানুষ যাইতে পারে না কাছে।'

'ও তাই কও।' আশ্বস্থ হলেন ভট্টাচার্য—'শ্মশান মশান আর থাকবো ক্যামনে কও। গায়ে কি আর মানুষ আছে। থাকনের মধ্যে আছি তো শুধু আমি আর গিন্নী, ভা'ছাড়া শুদ্দুরপাড়ায় কিছু। কে কবে মরব হেই আশায় থাক, তবে যদি আগুন জ্বলে কোনদিন। আর তা হইলেও যে জ্বলব হেই বা কই ক্যামনে? আমি যদি মরি তো টাইনা হ্যাঁচড়াইয়া শ্মশানে লইয়া যাওনের মতো একজন বামুনও নাই গ্রামে। আর আগে যদি গিন্নী মরেন তবে এই বুড়া বয়সে আর কিছু না পারি পুকুরপারে টাইনা নিয়া মুখে আগুন দিতে পারুম। অতদূরে শ্মশানে নিতে পারুম না!'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আতাউল্লা—'ভট্টাইজ, তোমরা না বামুন? তোমাগো জাতে না তোমরাই সক্কলের থেইকা বড়ো। কইতে তোমার সরম লাগে না, ধর্ম্মেরে অপমান কর, বেইজ্জতি কর। যদি কোন হাজীসাহেব কি ইমামসাহেব আইজ কইত এমন কথা তবে দেইখা লইতাম। কোরাণ শরীফের পাতা খুইলা দেখাইয়া দিতাম কতো বড়ো শাস্তি তাগো পাওন উচিত। আরে বাপু, হজ্জে যাইতে না পারো তো ইমান ঠিক রাখো তবেই না মুসলমান। তোমাগো ধম্মের বই পড়ি নাই ভট্টাইজ, তবে হলপ কইরা কইতে পারি ধম্মেরে অপমান করনের শিক্ষা কোন ধম্ম দেয় না। তোমার মুখে একটু বাধলো না ভট্টাইজ, বেহুঁসের মতো কথাটা কইয়া দিলা।' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। ছাতা তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে উঠোন পেরিয়ে গেলেন। হতবিহ্বল ভট্টাচার্য যেন বুঝতেই পারলেন না কি হতে কি হয়ে গেলো। শুধু বুঝলেন, প্রতিদিনের চোখে দেখা এই পাগল মানুষটির পাগলামী আসলে অর্থহীন নয়।

বটতলার শ্মশানে আগুন জ্বলধে না আর। কিন্তু জ্বলুক একবার। প্রমাণিত হোক, এ রাষ্ট্র শুধু মুসলমানের নয়—হিন্দুরও। অন্তত একজন হিন্দু নাগরিক পুরোপুরি ভাবে তার জীবন শেষ ক'রে গেছে এ'দেশের মাটিতে। যদি সাক্ষী খোঁজ—সাক্ষ্য দেবে এ' শ্মশান। কিন্তু আগুন বুঝি সত্যি জ্বলবেনা আর। এই এক দুশ্চিন্তাই যেন পাগল ক'রে তুলতে চাইছে আতাউল্লাকে। তবে কি বাঁচবে না এ' দেশ। এমনি করেই ধ্বসে যাবে তাঁর চোখের সামনে। কিন্তু এ' শাস্তি কেন পেতে হচ্ছে তাঁকে। নিষ্কলুষ জীবন তাঁর। শান্তি চান তিনি। চলে যেতে ইচ্ছে করে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন দেশে। যেখানে সুখ আছে,

স্বস্তি আছে। হজে যেতে ইচ্ছে হয়। সাহারার মসনদ নয়, মক্কা মদিনার ফকীরের জীবনই তিনি আজ চান। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো ওখানে বসেই গুনবেন। কিন্তু টাকা? আজীবনের সঞ্চয়ে আর যাই সম্ভব হোক এ' আশা মিটবে না আতাউল্লার। ভয় হয়, বুঝি খাঁটি মুসলমান হতে পারলেন না তিনি। কিন্তু ঝড় বয়ে যাক পৃথিবীর বুকে, তুফান উঠুক, ইমানের খুঁটি অটুট থাকবে তাঁর। প্রতিদিন যথারীতি তিনি নামাজ পড়েন পাঁচবার। (ফজর, জোহর, আছের, মকরেব আর এশা) কিন্তু নামাজই নয় শুধু—এরপরও তাঁর মোনাজাত বাকী থেকে যায়। দুহাত উর্ধ্বে তুলে খোদাবন্দের কাছে মিনতি জানান তিনি—ওয়াহু দাহু লা শরীকাল্লাহু। আমাদের গুনাহ্ তুমি মাপ করো খোদা। সেবকদের অক্লান্ত শ্রমে যে বেহেস্ত গড়ে উঠেছে তোমার জমিনে তাকে তুমি দোজখ হতে দিও না। রক্ষা করো, বাঁচাও খোদা। এ' নয়া দুনিয়ায় জন্ম দাও নতুন এক শাহানশা আকবরের, পাঠাও নতুন পয়গম্বর। নইলে তোমার এ' গুলবাগিচা যে বাঁচবে না খোদা।

বটতলার শ্মশানে আগুন। কে জানে, হয়তো এখনও সময় আছে। এখনও জ্বলতে পারে।

সেদিন রাতে অন্ধকার পথ বেয়ে একা একা এনায়েৎ ডাক্তারের বাড়ী এসে উঠলেন আতাউল্লা। মাধব চক্কোত্তি আর বেণু মল্লিক চলে যাওয়ার পর এনায়েতের পসার আজ জমজমাট। অন্ধকার উঠোনটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসে সরাসরি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। চাপা গলায় ডাকলেন—'ডাক্তার, ও ডাক্তার।'

বাড়ীই ছিলেন এনায়েৎ হোসেন। দরজা খুলেই চমকে উঠলেন—'আরে আপনে যে, আসেন আসেন। এমন কইরা কি আন্ধারে আইতে

হয়। লোক পাঠাইলেই পারতেন আমি যাইতাম।' তারপরই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার, বসতে দিলেন। তামাক সাজাতে দিলেন চাকরকে ডেকে—'তারপর কি মনে কইরা। বাতটা আবার বাড়ছে বুঝি। এত যে কই, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়—'

'আরে রাখো তোমার ডাক্তারীবিদ্যা।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমক দিলেন আতাউল্লা। তারপরই ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন ডাক্তারকে —'তোমার কাছে দাওয়াই নিতে তো আসি নাই ডাক্তার। আসো, কাছে আসো। একটা কথা কমু।'

এ' বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা করেন তরুণ ডাক্তার। ভয় মেশানো শ্রদ্ধা। পাশে এসে বসলেন এনায়েৎ হোসেন। একটু বিস্ময় তাঁর চোখে—'কি ব্যাপার কন দেখি।'

'আইচ্ছা ডাক্তার, গেরামে তো এখনও দুই-চাইর ঘর হিন্দু আছে তাগো খবর রাখো? কোন অসুখ বিসুখ নাই তো কারো?'

'নাই মানে? পিতাম্বর মণ্ডলের মায়রে লইয়া তো টানাটানি চলতাছে। সত্তর বছরের বুড়ী। তা'ছাড়া পশুপতির বউটার হইছে টাইফয়েড। আহা বেচারা, নতুন বিয়া করছে। দুই বছরও ঘুরে নাই। আমি গেলেই পাও জড়াইয়া ধরে। কান্দে আর কয়—অরে বাচান ডাক্তার সাহেব। একবার বাচাইলেই কইলকাতা লইয়া যামু। মরি তো ওইখানেই মরুম।'

'কইলকাতা!' বিদ্যুতের ছোঁয়ায় যেন আঁৎকে উঠলেন আতাউল্লা —'কইলকাতা যাইব এমন কথা কয় নাকি পশুপতি।'

'কয়, কিন্তু লইয়া যাইতে পারলো কই। শুধু সাগু-বার্লি খাওয়াইয়া সাধারণ জ্বর সারানো যায় কিন্তু টাইফয়েড সারাইতে টাকা লাগে মিঞাসাহেব। বউটারে সত্যি আর বাচাইতে পারলো না পশুপতি।

জানি, অগো লেইগা, হিন্দু মুসলমান সকলের লেইগাই আপনের পরান কান্দে কিন্তু বউটা যদি না বাচে তবে আমার দোষ দিয়েন না মিঞা-সাহেব। আমার কোন দোষ নাই।'

'হুঁ।' গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। লাঠিটা টেনে নিলেন কাঁপতে কাঁপতে—'পীতাম্বরের মার লেইগা আমি ভাবি না ডাক্তার। বুড়ী মরলে দুঃখ নাই তত। মরণটাই চাই। কিন্তু পশুপতির বউটারে বাচাও ডাক্তার। আহা, নতুন বউ।' কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকার পথে আবার বেরিয়ে পড়লেন আতাউল্লা।

গভীর উৎকণ্ঠায় রাত ভোর হল সেদিন। ফজরের আজান ভেসে এলো সুলতানী মসজিদ থেকে। আতাউল্লা উঠলেন। নামাজ পড়লেন কিন্তু তারপর আর দেরী নয়, ব্যস্তপায়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। ভোরও বুঝি হয়নি তখন ; জনহীন কাঁচামাটির পথে আতাউল্লা আজ প্রথম মানুষ। দু'পাশে গাছগাছালির পাতায় অবিরাম ঝিরঝিরানি। এর ওপর আশ্বিন শেষের কনকনে শীতের বাতাস। গায়ের মোটা চাদরটা আরও জোরে বুকে জড়িয়ে নিলেন আতাউল্লা। পুবপাড়ায় এসে পৌঁছুলেন পুরোপুরি আলো ওঠার অনেক আগেই। বনমালী দাসের বাড়ীর গা ঘেঁসা ঘরটাই পশুপতির ঘর। বেড়ার পাশে এসে ধীরকণ্ঠে ডাকলেন আতাউল্লা—'পশুপতি, পশু, জাগা আছস।'

'কে ?' কে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো ভেতরে।

'আমি রে আমি।'

'কে, মিঞাসাহেব ! আপনে !' ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো পশু-পতি—'সালাম আলেকম, মিঞাসাহেব। এই বিহানে কি মনে কইরা মিঞাসাহেব। আসেন, বসেন।' অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে পশুপতি।

'না, বসুম না। তর বউ ক্যামন আছে রে?'

'কষ্ট কইরা যখন আইলেনই একবার দেইখা যান মিঞাসাহেব। শরীল দিয়া যেন আগুনের হলকা ছুটতাছে। কথা কয় না, খাইতে চায় না। ডাক্তারবাবু কন—খরচ না করলে বাচবো না' বলতে বলতে সত্যি যেন ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে চায় পশুপতি—'আসেন মিঞাসাহেব, একবার দেইখা যাইবেন।'

'না, থাউক। একটা মানুষ রোগে ভুইগা কষ্ট পাইতাছে আর হেইটা খুব দেখনের জিনিস হইল। দেখুম রে, দেখুম, সাইরা উঠলে আবার যখন পুকুর থেইকা জল তুইলা আনবো তখন দেখুম। চুরি কইরা দেখুম।' বলেই বিচিত্র এক শান্ত হাসি হাসলেন আতাউল্লা। যেন নাতির সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুর প্রতিদিনের পরিহাস—'হ্যা পশু,—শুনলাম বউ নিয়া তুই নাকি কইলকাতা যাইতে চাস। সত্য নাকি?'

ভয়ে মাথা নোয়ালো পশুপতি।

'কিরে কথা ক। বউরে খাওয়াবি কি বিদেশ গিয়া।'

'এইখানেই বা বাচুম ক্যামনে মিঞাসাহেব।' সভয় উত্তর—'দোকানটা গেলো তারপর থাকতে থাকতে একটা মাত্তর গাই আছিলো হেইটাও দিলাম বিক্রী কইরা। অল্প জমি—মাত্তর পাঁচ কাঠা। দুই কাঠা বেচুম ভাবছি, দর উঠছে মাত্তর ছয়শ—'

'শোন পশু,'—কথা কেড়ে নিলেন আতাউল্লা। আলোয়ানের নিচে ফতুয়ার পকেটে হাত দিলেন—'নে পঁচিশটা টাকা রাখ। ওইসব বেচনের দরকার নাই। তর বাচ্চা মাইয়াটার লেইগা রোজ দুধ লইয়া আসিস আমার বাড়ি থেইকা। লজ্জা করিস না কিন্তু।'

'না, না, এ আপনে কন কি মিঞাসাহেব—'

'থাম, থাম।' ধমক দিলেন আতাউল্লা—'খুব যে ভদ্দরতা শিখছস্।

আর শোন্, টাকার অভাবে দোকান চালাইতে পারস নাই তুই। তর টাকা নাই কিন্তু আমার আছে। ভাবছি পাইনার হাটে একটা মুদীর দোকান দিমু আর তুই এই লাইনে কিছু কিছু জানস তাই তরেই বুঝাইয়া দিমু। কইলকাতা গিয়া না খাইয়া মরণের থেইকা এই কাম অনেক ভালো। নে, ভদ্দরতা করিস না। রাখ।' টাকাটা আবার এগিয়ে দিলেন আতাউল্লা।

অস্বীকার করতে পারলো না পশুপতি। টাকা ও নিল।

বিদায় নিয়ে পশুপতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন আতাউল্লা। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে আরও। পুবপাড়া থেকে উত্তর-পশ্চিম পাড়া।

একটি মৃত্যু হোক। বটতলার শ্মশানে আগুন জ্বলুক একবার। শুধু একবার। নতুন করে প্রাণবন্ত হোক এ'গ্রাম। আতাউল্লা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন।

পীতাম্বরের উঠোনে আতাউল্লা যখন এসে দাঁড়ালেন ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন। জনকয়েক প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বাইরের উঠোনে। বিচারকের মুখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনবার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতদের মতো সকলেই স্থির-অচঞ্চল। ধীরে ধীরে সকলের পেছনে এসে দাঁড়ালেন আতাউল্লা। চুপচাপ।

'মিঞাসাহেব আপনে ?' চমকে ওঠে সকলে।

—'কি খবর, এখন ক্যামন আছে পীতুর মা ?'

'কি জানি।' ঠোঁট ওল্টালো পাশের বুড়ো—'ভোর রাতে তো একবার অরা কাইন্দা উঠছিল, ভাবলাম—গেল বুঝি। আইসা দেখি যায় নাই তখনও। তারপর পীতাম্বর গিয়া ডাইকা আনছে ডাক্তার সাহেবেরে। ঘরের ভিতর কি হইতাছে ক্যামনে কমু মিঞাসাহেব।'

'এনায়েৎ আইছে নাকি এত ভোরবেলায় ?'

'হ।'

'বাঃ, সাবাস। খাসা ডাক্তার হইছে তো ছোকরা। এই তো চাই।' খুশিতে ভরে উঠলো আতাউল্লার মুখ। তারপর জোয়ান-মরদ একজনকে বেছে নিয়ে ডাকলেন কাছে—'এই পঞ্চা, শোন্।'

পঞ্চানন আতাউল্লার পিছু পিছু এলো উঠোনের কোণ অবধি। আতাউল্লা ওকে কাছে ডেকে বললেন—'আমি যাই। পীতাম্বর বাইরে আইলে কইস আমি আইছিলাম। আ। শোন্, তরা ঠিক থাকিস্। বুড়া মানুষ, কওন তো যায়না। যদি কিছু হয় তো তগোই লইয়া যাইতে হইব বটতলার শ্মশানে। দেশ-গায়ে কি আর মানুষ আছে, তগোই করতে হইব সব। পিতুরে কইস—টাকা যদি না থাকে তো আমার বাড়ি যেন লোক পাঠায়। আমার গাছ কাইটা আমি পোড়ানের লাকড়ি দিমু। বুঝলি, কথামত কাজ করবি। আমি চললাম।' খুব ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে গেলেন আতাউল্লা। ঘোমটা টানা বধুর মতো চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে।

পঞ্চানন বিহ্বল। সকলেই এ' ও'র দিকে তাকালো।

অবশেষে মৃত্যু তবে সত্যি এলো। প্রয়োজন ছিলো এ' মৃত্যুর। এ' জন্যে দুঃখ নেই আতাউল্লার। দেশের স্বার্থে, ধর্মের জন্যে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু শহীদের। বটতলার শ্মশানে আগুন জ্বলবে আজ। বহুদিন পরে অনেকটা হালকা হ'তে পারবেন তিনি।

পীতাম্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়েই নিজের ঘরে ফিরলেন না তিনি। গেলেন ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার বাড়ি নেই তিনি জানেন, কিন্তু

বসবার ঘর আছে। গৃহকর্তার আদেশ না পেলেও এ' মানুষটিকে অভ্যর্থনা করবে, তামাক সেজে দেবে এ' বাড়ির লোক। আতাউল্লা বসে রইলেন।

এনায়েৎ হোসেন যখন ঘরে ফিরলেন বেলা তখন চ'ড়ে গেছে অনেক। ব্যস্তপায়ে ছুটে এলেন আতাউল্লা—'খবর কি ডাক্তার। মরছে, মরছে তো?'

'না।' ডাক্তারের মুখ খুশির হাসিতে উজ্জ্বল—'এই যাত্রা বাইচা গেলো বুড়ী। চোখ খুলছে। কিছু ভাইবেন না মিঞাসাহেব—ভালো হইয়া যাইব।'

আঁৎকে উঠলেন আতাউল্লা। কোন এক অদৃশ্য হাত যেন সহসা সহস্র যোজন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তাঁকে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ডাক্তার। এ সংবাদে কি খুশি হলেন না মিঞাসাহেব?

বটতলার শ্মশানে তবে সত্যি আগুন জ্বললো না আর।

সেদিন হাটে গিয়ে আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন আতাউল্লা। খবরটা অবশ্য তিনি আগেই জানতেন। বাণীমন্দির পাঠাগার উঠে গেলেও খবরের কাগজ রোজই পড়েন তিনি। সংবাদটার গুরুত্ব নিজে বুঝলেও কাউকে বোঝাননি কোনদিন। ভয় ছিলো—যদি ওরা ভয় পায়। কিন্তু যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তাইতো হলো। আশেপাশের গ্রামগুলোতে আবার পালানোর হিড়িক পড়েছে। এবারই শেষ কিস্তি। এরপরে হিন্দুদের গাঁয়ে আর যদি কিছু অবশিষ্টও থাকে তবে তা রক্ষকহীন ভিটে, ভাঙ্গাঘর আর তুলসীতলায় ফণিমনসার চারা।

উদভ্রান্তের মতো বাড়ি ফিরলেন আতাউল্লা। না, না, এখানে

থাকলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। সত্যি, এ'দেশ তাঁকে পাগল ক'রে দেবে। তাঁর বেহেস্ত, তাঁর হাতে গড়া পৃথিবী।

কি জানি কেন, কিসের আকর্ষণে বাঘেরের জনহীন পল্লীতে সেদিন ঘুরে বেড়ালেন আতাউল্লা। শীতের সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে পরিত্যক্ত উঠোনগুলোতে ঘুরে বেড়ালেন একা একা। নিশাচর ছায়ামূর্তির মতো। চক্কোত্তীদের উঠোন, মিত্তিরদের পাকাবাড়ি, কুঞ্জ সাহার সখের বাগান। একে একে সব কিছুই ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বিষ্টু গোঁসাইর আখড়া আরও দূরে, বটতলার শ্মশান আরও অনেক দূর। এ' লুপ্ত জনপদে মানুষের পদধ্বনি বাজবে না কোনদিন। গড়ে উঠবে না সেই পুরোণো পৃথিবী। হয়তো উঠবে, ধ্বসে পড়া তাজমহল আবার গড়ে উঠবে কোনদিন, কিন্তু সেখানে শাহ্‌জাহান থাকবে না।

ক্লান্ত হৃদয়, বিষণ্ণ মন নিয়ে ঘরের দিকে ফিরলেন আতাউল্লা। বাড়ির কাছাকাছি এসেই একটু দাঁড়ালেন—চোখ পড়লো বাড়ির বাইরে আমতলার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তির ওপর।

'কে, কে ওখানে ?' গম্ভীর গলায় হাঁকালেন আতাউল্লা।

'আমি।'

'ভট্টাইজ্, তুমি ?' ব্যস্তপায়ে এগিয়ে এলেন আতাউল্লা—'এমন রাত্রে যে, কি মনে কইরা। আসো, বস।'

'না, বসুম না মিঞাভাই।' আতাউল্লার একটা হাত সহসা নিজের হাতে টেনে নিলেন ভট্টাচার্য।

হাসবার মত মন নয় তবু কি ভেবে যেন পাগলের মতো হেসে উঠলেন আতাউল্লা—'এইটা তুমি করলা কি ভট্টাইজ্।'

'ক্যান, কি হইছে ?'

'ছানের পরে শুদ্দুর কায়েতের ছোঁয়া লাগলে তুমি পুকুরে গিয়া ডুব

দেও। আর বলা নাই, কওয়া নাই একেবারে মুসলমানের হাত টাইনা নিলা।'

'তুমি হাসতাছো মিঞাভাই। হাসো।' কিসের ব্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয় ভট্টাচার্যের। কাঁপছে, কথাগুলো যেন জড়িয়ে আসছে মুখে।

'ব্যাপার কি ভট্টাইজ্?

'আইজ দুপুরে রমেনের চিঠি পাইছি। লেখছে—পাসপোর্ট না কি হইতাছে যেন। আগামী মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারের মধ্যে যেন চইলা যাই রমেনের মায়েরে লইয়া। নেইলে বিপদ আছে—জীবনে আর ছেইলা নাতির মুখ দেখতে পারুম না।'

শিউরে উঠলেন আতাউল্লা। কম্পিতকণ্ঠে অতিকষ্টে বললেন—'তুমি, শেষে তুমিও ভট্টাইজ্—'

'উপায় নাই ভাই।'—সহসা আতাউল্লাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন ভট্টাচার্য—'আমারে মাপ করো ভাই, দেশমাটির উপর আমার কি মায়া নাই, বুক কান্দে না তোমার মতো। কান্দে, কি করুম ভাই। ছেইলা নাতি থাকবো একদেশে আর আমরা বুড়া-বুড়ী পইড়া থাকুম এইখানে। এই অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতা মিঞাসাহেব। তুমি পারতা ছেইলার মায়া ছাড়তে? পারতা?'

দু'দিন আগে হলে কি হতো জানিনে তবে সেদিন ভট্টাচার্যের মুখে এমন কথা শুনেও চুপ করেই রইলেন আতাউল্লা। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর ধীরে ধীরে ভট্টাচার্যের বাহু থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে—'যাইবা, নিজের ছেইলার কাছে যাইবা তো আমারে কওনের কি আছে। যাও।'

মন্থরপায়ে ভেতরে চললেন আতাউল্লা।

'মিঞাসাহেব।' পিছু পিছু ভট্টাচার্যও এলেন উঠোন অবধি—'মিঞাসাহেব শোন।'

'কি।'

'রমেন লেখছে—ঘর বাড়ী সব বিক্রী কইরা রওনা হইতে। টাকা পাঠাইতে পারে নাই। আমারে একটু সাহায্য করো ভাই—গোটা কুড়ি টাকা দিতে পারো। না হয় ঘরের টিনগুলি তুমিই বেইচা লইও পরে। দশজনেরে ডাইকা কইয়া যামু—এই ঘর তোমার।'

'টাকা আমার নাই ভট্টাইজ্, যা আছিলো খরচ কইরা ফালাইছি।' পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে ভট্টাচার্যের দিকে একবার তাকালেনও না আতাউল্লা।

'ভাই।'

'ঘরে যাও ভট্টাইজ্।' এবারে মুখ ফেরালেন আতাউল্লা—'কইতাছি যে, টাকা আমার নাই। থাকলে দিতাম। যাও।'

এরপরেও হাত বাড়ানোর নাএই বুঝি ভিক্ষে। ভট্টাচার্য ফিরলেন।

ভট্টাচার্যকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেও কি খুব খুশি হলেন আতাউল্লা। বুক পুড়ে যাচ্ছে তাঁর, জ্বলে যাচ্ছে। সে' খোঁজ কি ক'রবে ভট্টাচার্য। ক'রবে না, শুধু ভুলই বুঝবে। ভট্টাচা চলে যাবে, বামুনপাড়ার শেষ মানুষটিও থাকবে না আর। ভাবতে ভাবতে উতলা হয়ে ওঠেন আতাউল্লা। সব কিছুই যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তাঁর। না, না, এ'বার তিনি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। পাগল করে তুলবে তার পৃথিবী।

'মিঞাসাহেব।'

চমকে উঠেন আতাউল্লা। কার যেন ভয়ার্তকণ্ঠ ভেসে আসে উঠোন থেকে। ছুটে যান তিনি—'কে, কে এত রাত্রে।'

'আমি মিঞাসাহেব।'

'কি রে পশু, কি খবর?' আতাউল্লার গলায় ঝাঁঝ মেশানো—'টাকা চাই, না?'

পশুপতি চুপ।

'কিরে কথা ক।' আতাউল্লা এগিয়ে এলেন—'বউ ক্যামন আছে তর।'

'একটু ভালো হইছে। ডাক্তার সাহেব দিনকয়েকের লেইগা ঢাকা যাইতে কইতাছেন। শহরের হাসপাতালে থাকতে হইব দিন কয়েক।'

'কিন্তু তাতে আমার কি করতে হইব?'

'কিছু টাকা দেন মিঞাসাহেব। কিছু জোগাড় করছি।' আতাউল্লার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ে পশুপতি। কান্না-কাঁপা গলায় ভেঙে পড়ে—'ও না বাচলে আমিও বাচুম না মিঞাসাহেব। আপনে মা-বাপ। আমাগো বাচান।'

'টাকা আমার নাই পশু।' আতাউল্লা সরে এলেন—'তরা বেইমানের জাত। তগো ভালো করতে নাই। নিজের দেশরে যারা ভুলতে পারে তারা বেইমান না তো কি?'

'আমি আপনের গোলাম মিঞাসাহেব! দেশগেরাম ফাকা হইয়া গেলেও আমি থাকুম। আপনের পায়ে পইরা থাকুম চিরকাল।' ছেলেমানুষের মতো কাঁদে পশুপতি।

'পশু।' আতাউল্লা গম্ভীর গলায় ডাকলেন—'ওঠ। ভুল অনেক করছি তবু আর মাত্তর দুইটা পরীক্ষা করুম। ওঠ, কত টাকা তর চাই।'

'গোটা দশেক।'

ঘর থেকে তাই এনে দিলেন আতাউল্লা। চল্লিশ মন পাট বিক্রী করে কতো টাকা পেতে পারে একটা মানুষ। যাই পাক, দান করে বেড়ালে তার ওজনটা খুব বেশি নিশ্চয়ই নয়। খুশি হয়ে ফিরে যাচ্ছিলো পশুপতি। আতাউল্লা আবার ডাকলেন—'পশু, সত্য তো, বেইমানী করবি না।'

'না।'

হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন ভট্টাচার্য। ঘর তবে সত্যি বিক্রী করতে হবে তাঁকে। চোখের সামনে তাঁর ঘরের চাল খুলে নিয়ে যাবে এটা তিনি সইতে পারবেন না বলেই ধার চেয়েছিলেন টাকা ক'টা। পরে তিনি যেমন করে হোক ফেরৎ পাঠাতেন। কিন্তু আতাউল্লা তাঁকে হতাশ করেছেন।

অথচ পরদিন ঘুম ভাঙ্গার পর আতাউল্লার মুখই প্রথম দেখলেন ভট্টাচার্য।

'কবে যাইবা তোমরা।'

ভট্টাচার্য গম্ভীর। মোড়া এগিয়ে দেবার তাড়া নেই, খুশি করার মতো কথা বলারও ব্যস্ততা নেই তেমন।

'কবে যাইবা।' আতাউল্লা আবার প্রশ্ন করলেন।

ঘরটা বিক্রী হইলেই রওনা হমু। নেইলে যাওনের টাকা পামু কই।'

'এই নাও তোমার টাকা। আইজই বিদায় হও।' আলোয়ানের ভেতর থেকে হাত বের করলেন আতাউল্লা। মুঠোয় লুকোনো টাকা ক'টা ফেরৎ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েই এগিয়ে দিলেন—'নাও, কিন্তু রমেনেরে আর তোমার হিন্দুস্থানের ভাইগো গিয়া কইও—আমার

আসনের টাকা আছিলো না আর হেই টাকা দিছে একজন মুসলমান। হেই কথা কি তোমরা গিয়া আর কইবা ভট্টাইজ্। কইবা—শালা শেখের জাতটাই বজ্জাত। শালারা বেইমান।'

বোবা হয়ে যান ভট্টাচার্য। মুহূর্তে যেন এই রোজকার চোখে দেখা মানুষটি আরও অত্যুন্নত হয়ে ওঠেন। টাকা তিনি নিলেন। কিন্তু এত অপমান সয়েও একটি কথা বলতে পারলেন না চোখ তুলে। ঠিক এই মুহূর্তেই তিনি স্পষ্ট বুঝলেন—কাল যতোবড়ো আঘাত তিনি দিয়েছেন আতাউল্লাকে এতোবড়ো আঘাত হয়তো কোনদিন দেননি আর কাউকে, আতাউল্লাও পাননি। কিন্তু মিঞাসাহেবই বা কেন বোঝেন না তাঁর ব্যথা—নিজের মা মরে গেছে, বিমাতাকে মা ডাকতে হবে। সে ব্যথা কি কম?

ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

গেলো, গেলো, সব গেলো। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়ায় মানুষ নেই, শুদ্দুরপাড়ায়ও ভাঙন ধরেছে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন আতাউল্লা। কারণে-অকারণে গালাগালি, চোখের সামনে দ্বিতীয়জনের উপস্থিতি অসহ্য মনে হয়। তবু হয়তো নিজেকে সামলে নিতে পারতেন কিন্তু কিছুদিন হলো একটা চিঠি এসেছে ঢাকা থেকে—পশুপতির চিঠি—বউ ওর ভালো হয়ে উঠেছে। মিঞাসাহেবের কাছে ঋণ ওর চিরদিনের মতো জমা থেকে যাবে। কিন্তু দেশের এ'অবস্থায় যুবতী বউকে নিয়ে গ্রামে ফিরতে সাহস পাচ্ছে না ও। মিঞাসাহেব যেন ক্ষমা করেন—বউকে নিয়ে ও কলকাতা চলে যাচ্ছে।

বেইমান। সব শালা বজ্জাত। সব ভুল, সব মিথ্যে। তামাম দুনিয়ায় একমাত্র সত্য—কোরাণ শরীফ। দরজায় খিল উঠলো

সারাদিনের জন্যে। দিনে—খোলা জানালার ফাঁকে সূর্য-রোদে, রাতে, হারিকেন জ্বেলে সুর করে কোরাণ আবৃত্তি করেন আতাউল্লা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, শুধু আছে আসমান, আছেন আল্লা।

ভয় পেলেন আসিয়া বেগম। লোক পাঠালেন ডাক্তারের কাছে।

এলেন ডাক্তার।

অনেক চেষ্টায় দরজা খোলা হলো। স্তব্ধ ঘর। কোরাণ শরীফের ওপর মাথা ঢেলে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন আতাউল্লা। ঘুম—দু'দিনের অনাহার আর ক্লান্তির পর এ' বৃদ্ধদেহ কতো আর সইতে পারে? জীবনে এই বুঝি তাঁর প্রথম ছন্দপতন। একবেলা নামাজ পড়া হয়নি। ফজরের আজান তাঁর ঘুম ভাঙ্গতে পারেনি আজ। তবে কোরাণ ছিল মাথার তলায়।

অত্যন্ত লঘুপায়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন এনায়েৎ ডাক্তার—'মিঞাসাহেব।'

সাড়া নেই।

দেহটাকে আলতোভাবে নাড়লেনও বেশ কিছুক্ষণ। ডাকলেন—'মিঞাসাহেব।'

'কে, কে?' ধড়ফড় করে উঠে বসলেন আতাউল্লা। যেন স্বপ্ন দেখে উঠলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাকালেন চারদিকে। যেন সবাই নতুন। কাউকেই চিনছেন না তিনি—'কি চাই?'

'আমি মিঞাসাহেব।' এনায়েৎ ডাক্তার। চলেন, বাইরে চলেন।'

'বাইরে যামু?' আতাউল্লা বিস্মিত চোখে তাকান—'কই, কাফন কই আমার। আনছো কাফন?'

'এইসব আপনে কন কি মিঞাসাহেব? কথা শোনেন...'

'যাও, তুমি যাও ডাক্তার। ডাক্তার হইছ ঘরে বিষ রাখতে পারো নাই? শালা হিন্দু জাতটারে বিষ খাওয়াইয়া মারতে পারো নাই যখন সকলে আছিলো। এখন ঔষধ দিয়া, ইঞ্জেকসন দিয়া তো বাচাইলা! কই, ধইরা রাখতে পারলা?'

রোগী চিনতে ভুল করলেন না ডাক্তার। ধীরে ধীরে বিষণ্ণমনে বেরিয়ে এলেন।

ডাক্তার চলে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আতাউল্লা। ডাকলেন চাকর আসরাফকে। চড়াগলায় হুকুম দিলেন—'যা, শুদ্দুরপাড়া, ডোমপাড়া, চাষীপাড়া যেইখান থেইকা পারস জোয়ান-মরদ দুইটা হিন্দু ধইরা আন। আর দুইটা কুড়াল জোগাড় করিস। যা শিগ্গীর যা।'

আসরাফ এগোতে চায় না।

এবারে এগিয়ে এলেন আসিয়া বেগম—'বুড়ার কি মাথা খারাপ হইল নাকি। কুড়াল দিয়া কি হিন্দু জবাই হইব?'

ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এলেন আতাউল্লা—'জবাই-ই হইব। হিন্দুরে কাটনের আগে তরে কাইটা লমু।'

এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো আসরাফ। আতাউল্লা ছুটে গিয়ে ঠাস করে অতর্কিতে একটা চড় মেরে বসলেন ওর গালে—'যা, আর যদি কাউরে ধইরা আনতে না পারস তো তুই ফিরিস না আমার বাড়ি। যা।'

অগত্যা যেতেই হলো। কিন্তু সারা গ্রাম ঘুরে শুধু মাত্র দুটো হিন্দু জোগাড় করতে এক গা ঘামলো আসরাফ। অবশেষে ডোমপাড়া থেকে খুঁজে বের করলো জগু ডোমকে। একটু বয়স বেশি কিন্তু গায়ের জোরে দুটো জোয়ানের মতো। জগুর কুড়োল নেই। তবু ওকেই মিঞাসাহেবের নাম ক'রে ধরে নিয়ে এলো আসরাফ। এসে ভয়ে ভয়ে

জানালো প্রভুকে—এর বেশি করা যে কতোবড়ো অসম্ভব ব্যাপার তা কিছুটা ভাষায়, কিছু জগুকে সাক্ষী রেখে ওর মুখের ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করলো আসরাফ।

'কি রে জগু, পারবি তুই ?' আতাউল্লা তাকালেন জগুর দিকে—'অবশ্য আসরাফ সাহায্য করতে পারে তরে। আমিই কুড়াল দিমু, খাওনের চাউল ডাইল দিমু, টাকাও দিমু কিন্তু বিকালের মধ্যে ওই আমগাছটা কাইটা বেশ কয়েক আঁটি জ্বালানি কাঠ কইরা দিতে হইব, পারবি তো ?'

খোরাকি আর বকশিস একসঙ্গে। জগু ডোমের পেশা না হলেও রাজী হলো সে। এতবড়ো লোভ সামলানো সম্ভব নয় তার পক্ষে—'ক্যান পারুম না মিঞাসাহেব। খুব পারুম। দ্যান, কুড়াল দ্যান।'

আতাউল্লার ইশারায় ঘরের কুড়োল এনে দিলো আসরাফ। সোৎসাহে জগু কাজে লেগে গেলো। অনেকক্ষণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ দেখলেন আতাউল্লা। তারপর রোদের তাপে মাথা যখন গরম হয়ে উঠলো ফিরে এলেন ঘরে। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই এসেছিলেন অসুস্থ মিঞাসাহেবকে দেখতে কিন্তু সকলকেই তাড়িয়েছেন আতাউল্লা। অবান্তর মানুষগুলোর উপস্থিতি যেন সইতে পারছেন না তিনি। কিন্তু এনায়েৎ ডাক্তার যখন এলেন তখন ঘরে ঢুকে খিল তুললেন।

নিজের প্রতি মিঞাসাহেবের এ' ঔদাসীন্য এনায়েৎ ডাক্তার লক্ষ্য করলেন দূর থেকে। তবু এলেন—'গাছ কাটতাছস ক্যান রে আসরাফ। কি হইব ?'

'কি জানি ডাক্তারসাব। কর্তার হুকুম, তাই তামিল করতাছি। কি হইব ক্যামনে কমু।'

চলে যাচ্ছিলেন ডাক্তার। হঠাৎ মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন বোরখা

ঢাকা আসিয়া বেগম। আড়ালের নারী নন্, পাগলের মতো ছুটে এলেন সহসা। ভীতকণ্ঠে বললেন—'কাঠ কাটনের হুকুম ক্যান ডাক্তার সাহেব ?'

'কি জানি।' এবারে কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারলেন না এনায়েৎ ডাক্তার—'ক্যামনে কমু, আমি তো জানি না।' কিন্তু নেমে এসে নিজেও বিচলিত হলেন এনায়েৎ হোসেন। এমন একটা মানুষ—শেষে সত্যি কি পাগল হয়ে গেলেন ?

সেদিন রাত্রেই আগুন জ্বললো বটতলার শ্মশানে।

রাতনিশুতির অন্ধকার। চুমকিঢালা সামিয়ানার মতো তারাজ্বলা আকাশের নিচে, দিগন্ত-বিস্তৃত সোনালী ক্ষেতের মাঝখানটিতে আকস্মিক-ভাবে জ্বলে উঠলো এ' আগুন। বিশ্বলোলুপ অজগরের রসনার মতো এ' আগুনের লেলিহান শিখাও যেন সব ভস্ম ক'রতে চায়।

কিন্তু কে করলো এ' সর্বনাশ ? ধান কাটা সুরু হবে আর মাত্র দিন দশেক পরে। এ' আগুন হাজার চাষীর নবান্ন-স্বপ্ন নষ্ট করতে পারে। রোল উঠল চারদিকে। লাঠি-সোটা, জলের বালতি নিয়ে ছুটে এলো মানুষ। কে, কে এত বড়ো সর্বনাশ করতে পারে গাঁয়ের।

কিন্তু কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো সবাই, চমকে উঠলো দেখে। শ্মশানের এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন আতাউল্লা ? মুখে তাঁর হাসি, আত্মপ্রসাদের দ্যুতিতে ভয়ংকর! আগুনের রঙে রাঙিয়ে গেছে দেহ, ঘেমে নেয়ে গেছেন তবু অপলক চোখে সে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'এ আপনে করছেন কি মিঞাসাহেব ?' এগিয়ে গিয়ে আতাউল্লাকে টেনে আনে একজন। মানুষ ভুলে গেলো তাদের পুরানো মিঞা

সাহেবকে—'এত বড়ো সর্বনাশও আপনে করতে পারলেন মিঞাসাহেব।' হঠাৎ হ্যাচকা টানে সংবিৎ ফিরে পেলেন আতাউল্লা। চীৎকার করে উঠলেন—'গ্যাখ, গ্যাখ তরা গ্যাখ সকলে। আগুন, আগুন, এমন আগুন হিন্দুরাও কোনদিন জ্বালাইতে পারে নাই তাগো শ্মশানে। নে দেইখ্যা নে, দুই চোখ ভইরা দেইখ্যা নে!'

'হেই আগুন তুমি গ্যাখ বুড়া। আমাগো গ্যাখনের কাম নাই!' টানতে টানতে আতাউল্লাকে নিয়ে চলে দু' চারজন।

আতাউল্লা তবু থামেন না। তাঁর চীৎকারে আকাশ ফেটে যেতে চায়—'পাকিস্তানের শ্মশানে আগুন জ্বলে না, এতবড়ো মিথ্যাকথা ক্যামন কইরা কয় লোকে! হিন্দুস্থানের লোকেগো ডাইকা আইনা দেখা—পাকিস্তানের শ্মশানেও আগুন জ্বলে। ওই শালাগো—'

কিল চড়চাপড় অবশ্য পড়েনি সেদিন তবে আতাউল্লার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। বিশেষ করে এ গ্রামের মাটিতে এত লাঞ্ছনা তিনি পাবেন কল্পনাও করেননি কোনদিন।
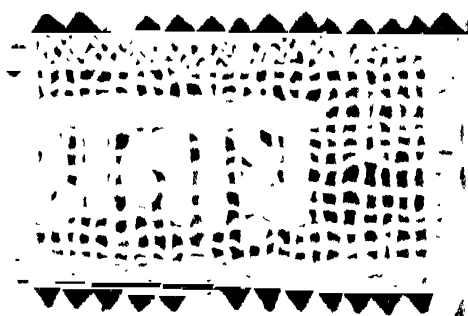
মাঠের কোণে সবুজ ঘাসে গা ছড়িয়ে আপন মনে বই পড়ে সাগর। মুখর সহর এখানে স্তব্ধ, জন কোলাহল বর্জ্জিত এই শান্ত কোণে। বেশ লাগে এই প্রশান্তি, নিরিবিলি সবুজ শয্যা আর এই নগর গোধূলি। বড় বেশী কেউ আসে না এখানে। ওধারে ফুটবল খেলা, ওকোণে শিশুমহল—দোলনা, স্লিপার আর প্যারালালবার আর অন্য কোণে বুড়োদের দাবা-পাশা-তাসের আসর। ওদিকেই যায় সব, তাছাড়া এদিকে আনাগোনা করে যারা তারা সব সাগরেরই মতো। শান্তি আর নিরিবিলি ভালো চায়। বিকেল শেষে সাগর এসে বসে এখানে। বই পড়ে, [illegible]। স্বচ্ছ সহজ বাংলো [illegible]।

হঠাৎ [illegible] পেছন থেকে এসে। [illegible]। মৃদুস্পর্শ, কোমল হাত। কাঁকন চুড়ির রিনঝিন্।

সাগর হাসে। হাত দিয়ে হাত সরাতে চায়— আঃ, ছাড়ো।'

'উঁহু, বলো কে ?'

'তুমি।'

'আমি কে ?'

'তুমি তুমি।'

'উঁহু, নাম বলো। নইলে ছাড়ছিনে।' বাঁধন আরও শক্ত হয়।

'আঃ ছাড়ো নীতা। লাগে না বুঝি।'

'বারে, বাহুবাঁধন খুলে যায়। হাসির দমকে গড়িয়ে পড়ে নীতা—তুমি কিছু না। এতেই লাগে বুঝি?'

'লাগে না? আচ্ছা, তোমায় যদি ধরতাম তবে তো কেঁদেই ফেলতে।'

'হুঁ', অদ্ভুতভাবে মুখটা নাড়ল নীতা। চুলগুলো দুলে উঠল—'আমি তো আর ছেলে হয়ে মেয়ে নই তোমার মতো।'

'মেয়ে হয়ে ছেলে। এইতো'—সাগর হাসলো—'ব্যস্ সমান অপরাধ।'

নীতাও হেসে ফেললে—'দুষ্টু।'

হাসতে হাসতে আবার বলল সাগর—'আজ এতো দেরী করলে কেন?'

ভারিক্কী হওয়ার চেষ্টা করল নীতা—'তোমার মতো তো খেয়েদেয়ে ঘুরে বেড়াই না। স্কুল আছে, পড়া আছে, গান আছে আরও কতো কি।'

'এ আর ক'দিনের ছুটি বলো? তারপরই আবার সেই পড়া আর পড়া।'

নীতা আরও একটু এগিয়ে আসে—'আচ্ছা সাগরদা, তুমি পাশ করবে, কলেজে যাবে, তাই না? কি মজা হবে বলো তো।'

'কে জানে, স্কুলও হতে পারে।' সাগর হাসলো।

'ইস্।' ঠোঁট ওল্টালো নীতা—'অতোই সোজা কিনা। তুমি পাশ করবে। ভালো পাশ। দেখে নিও। আংগুল নেড়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করে নীতা।

নীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সাগর। পলক পড়ে না চোখে।

নীতা সুন্দর। গায়ের রং কালো কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখছু'টো, অদ্ভুত দীপ্তি ওর দেহলাবণ্যে।

'নীতা।' সাগর ব'লে—'ধরো, যদি আমি ফেল করি?'

নীতা কেঁপে ওঠে। ভয় পেয়েছে যেন—'ছিঃ, বলে না ওসব।

'ব'লো বলবে না।' নীতার মুখ সত্যি কালো হয়ে গেছে।

সাগর হেসে ফেলে—'এতো ভীরু তুমি নীতা? ভয় নেই, পাশ করব। দেখো।'

'তাহলে বলছিলে যে?'

'এমনি। কেমন, এইমাত্র না বললে, ভয় পাও না তুমি।'

নীতা হাল্কা হয়। ছ'জনেই হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'সাগরদা।'

'ব'লো।'

'কাল তুমি যাবে না ওখানে? কঙ্কার জন্মদিনে।'

'কঙ্কা? কে সে?'

'শান্নুদাকে চেনো?'

'শান্তনু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় বলেছে ও ওদের বাড়ী যেতে। কিন্তু কেন, বলো তো?'

'শান্নুদার বোন কঙ্কাব জন্মদিন কাল। আমাকে বলেছে কঙ্কা। বললো—তুমিও নাকি যাবে? যাবে তো।'

সাগর অবাক হয়ে যায—'সেকি, আমায় ও চিনল কেমন করে?'

'কি জানি, কি কনে বলবো।'

কঙ্কা। মনে মনে ছ'বার শব্দটা আওড়াল সাগর। শান্তনুর বোন বলে যাকে চিনতো ও সেই কঙ্কা? পথে ফুটপাতে অথবা দোতলার

'কাকে চাই?'

'শান্তনু আছে?'

'একটু দাঁড়ান।'

দাঁত দিয়ে বৃদ্ধাংগুষ্ঠের নখ কাটে সাগর।

'অতো দেরী করলি যে? তোর কথাই ভাবছিলাম। অতো করে বললাম অথচ। আচ্ছা আয়।'

সাগরের সংকোচ কাটেনি তখনও। পা কাঁপে। শান্তনুই ওকে টেনে নিয়ে যায় জোর করে—'আয়, ভয় কি?'

ভয় হয়তো নেই কিন্তু নিষ্পাপ অভিসারীর মতো চলতে চলতে হঠাৎ সত্যি ভয় পায় সাগর। কয়েক সিঁড়ি ওঠার পরেই পা থেমে যায় ওর। শিউরে ওঠে বাঁদিকের ঘর—'[illegible]' আলোর চোখ ঝলসানোর মতো সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়ানো আশ্চর্য সুন্দর এক মেয়ে। দুধে ধোওয়া দেহ। আকাশী সালোয়ার আর কাবীর ওপর সাদা ওড়না। হাতে স্প্যানিয়েলের শেকল, পায়ের কাছে ডগি।

'ওকি, থামলি কেন। ও আমার বোন কঙ্কা।' বলল শান্তনু।

সাগর গুটি গুটি পায়ে আরও কয়েক ধাপ উঠে এসে হাতের বইটা এগিয়ে দিল। সাদা সুন্দর কয়েকটা আংগুল দেখতে পেল সাগর আর একটা হীরের আংটি। অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

বেশ বড়ো ঘর। সোফায়, কৌচে দেহ এলিয়ে কান পেতে আছে সব। সেতারের ঝংকারে তরঙ্গিত ঘন বাতাস। পাশাপাশি ওরা বসল দু'জন। একটি কথা এখনও বলেনি সাগর। দৃষ্টিতে তেমনি মূঢ়তা। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কাকে যেন খুঁজছে ও। নীতা আসবে বলেছিলো কিন্তু আসেনি তো। শান্তনুকে প্রশ্ন করতেও কেমন যেন বাঁধলো, কিসের সংকোচ যেন।

সেতার থামল। সাগর চমকে উঠল নীতাকে দেখে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তানপুরোটা তুলে নিলো ও। কণ্ঠ বেজে ওঠে—'মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর'। সাগর শোনে, ওর সংকুচিত মন যেন প্রাণ ফিরে পায়। নীতা গান গায়, নাচে, সেতার বাজায়। গুঞ্জন মুখর আসরে মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা টেনে আনবার অদ্ভুত দক্ষতা আছে ওর। নীতার গান, নীতা গাইছে, আকুল হয়ে শোনে সাগর। শোনে সবাই। সকলকে বোবা করে দিয়ে নীতা আজ একা মুখর। সুরের দোলায় দেয়াল কাঁপে, মানুষের মন দোলে। সাগর খুসী হয়। কৃতিত্ব যেন নীতারই শুধু নয়, ওরও। এই ওর আত্মপ্রসাদ। গান থামে। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত।

'হোক না আরেকটা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোক।'

নরম গদিতে গা এলিয়ে চোখ বোজে সাগর। নীতা ভালো গায়। সে গান সবার কাছে ভালো। আপত্তি করল না নীতা। গাইল।

বেশ গান। সাগর ভাবল—কথাগুলো যদি গীতিকারের কথা না হয়ে নীতার মনের কথা হতো। বেশ হতো, বেশ হতো তা'হলে।

আসর জম্‌জমাট।

চিকের পর্দা নড়ে উঠল হঠাৎ। অভ্যাগতদের সানন্দ উল্লাসে নীতা ম্লান হয়ে গেল। রূপজ্যোতি ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো কঙ্কা। পরণে লাল বেনারসী, গলায় মালা আর শুভ্রললাট শ্বেত চন্দনে বিচিত্রিতা। দীপ্তমূর্তি। সাগর যেন শান্তি পাচ্ছে না এখানে। নীতা আর কঙ্কাকে একসঙ্গে দেখতে সে চায়নি কখনও। কঙ্কা স্বপ্ন, নীতা গান। কে সুন্দর? শ্বেতপদ্ম আর রক্তগোলাপ পাশাপাশি রেখে যদি প্রশ্ন করা যায় কে সুন্দর তবে তার উত্তর মেলে না।

'সাগরদা।'

সুপুরী গাছের মাথার ওপর চোখ রেখে উদাস হয়ে বলে সাগর—'বলো।'

'গান শুনবে?' ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল নীতা।

'গান?' সাগর হতবাক—'এখানে গাইবে?

'কেন ক্ষতি কি?' 'আমার গান ভালো লাগে না এই তো?'

'কি বলছো যা তা। আমি কি তাই বললাম।' বিব্রত হয়ে পড়ে সাগর—প্রচুর টাকা আছে বলেই কি তুমি অপচয় ক'রবে? তোমার গান ভালো লাগে বলেই এখানে আমি গাইতে দেব না তোমায়।'

একটু হেসে আনত মাথা ওপরে তুলেই চমকে ওঠে নীতা—'কঙ্কা তুই?'

কঙ্কা? পেছনে তাকায় সাগর। হ্যাঁ, কঙ্কাই। সেই বেশ, নীল সালোয়ার পাঞ্জাবীর ওপর সাদা ওড়না। সংগে টমি।

'এসেছিলাম বেড়াতে। তোদের দেখে দাঁড়ালাম।'

'বেশ, আয় বোস্।' নীতা ডাকল।

কঙ্কা নড়ল না। সাগর বুঝল না কি করবে ও। কি করা উচিত।

'আয়।'

'না যাই।' কেমন যেন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চাইল কঙ্কা—'তোরা থাক্।'

'শোন।' নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকলো—'এসো, বসো।' সাগর বলেই ফেলল শেষে।

কঙ্কা ফিরল, কাছে এল, বসল পাশে। নিজেকে একটু গুটিয়ে নিল সাগর। নীতা আর কঙ্কার মাঝখানে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে

হলো। নীতার মতো কেন নয় কঙ্কা। মুখোমুখী হওয়ার সঙ্গে ই চোখ নেমে আসে। কিন্তু কেন? কেন, এমন হয়?

'ওকি চুপ করলে যে সাগরদা।'

'কি বলব, বলো?' সাগর বলার মতো কথা খুঁজে পায় না।

'কঙ্কা কিন্তু বেশ গায়। তাই না?'

'যাঃ।' কঙ্কার সলজ্জ প্রতিবাদ—'কি অসভ্য।'

'হুঁ, ভালো।' এছাড়া কিছুই যেন বলার নেই আর। সাগর ওর মত জানায়।

'সাগরদা।'

সাগর কেঁপে ওঠে। তাকায় কঙ্কার দিকে। প্রথম দেখা। সুন্দর চোখদুটো, কণ্ঠমালার হীরকখণ্ডের মতো।- কিছু বলবে?

'আমাদের বাড়ী যাও না কেন তুমি? সবাই যায়, এক তুমি ছাড়া।'

সাগর হাসল—'যাব।'

চুপচাপ বসে ছিলো নীতা। হঠাৎ বলল—'কঙ্কা তোর টমি কোথায়?'

'তাইতো।' এদিকে ওদিকে তাকায় কঙ্কা—'সত্যি তো, কি করব এখন।'

'কেমন মজা। কথা বলার সময় যেন কোন হুঁসই থাকে না তোর।'

'থাক্, তোর আর বাহাদুরী করতে হবে না।' কঙ্কা মাথা ঝাঁকে। পেছনের চুল নেচে ওঠে—'আমি যাই, কেমন সাগরদা।'

'দেখি কোথায় আছে দুষ্টুটা। যাই কেমন?'

'যাও।'

কঙ্কা উঠল। দৌড়োতে দৌড়োতে আঁধো আঁধারে মিলিয়ে গেল সাদা ওড়নাটা, উড়তে উড়তে উড়ে গেল। দুচোখ ভরে দেখল সাগর।

'চলো যাই। সন্ধ্যে হ'ল।'

'চলো।' আত্মবিস্মৃত সাগর হঠাৎ জেগে ওঠে।

হাতে হাত ধরে ওরা পথ চলে। সম্মুখ পথে একটা ওড়না, একটুকরো সাদা মলমল যেন উড়ছে। স্পষ্ট দেখতে পায় সাগর। সারা পথ তাই মনে হয়।

ক্যারম বোর্ডে চমৎকার হাত কঙ্কার। সেখানেই বারবার সাগরের পরাজয়। পিংপং টেবিলে শাস্তস্থ ওদের দুজনেরই গুরু। বিলিয়র্ডষ্টিক এখনও ধরতে পর্যন্ত শেখেনি কঙ্কা! সাগর আসে প্রায়ই। গল্প করে, গান শোনে, খেলে। ক্যারম্, টেবিল টেনিস্, কখনও বা বিলিয়র্ডও। ধীরে ধীরে সাগর হালকা হয়ে ওঠে, কঙ্কাও কাছে থেকে কাছে এগিয়ে আসে দিনদিন। কতো রংয়ে রাংগিয়ে ওঠে ওদের কৈশোর বসন্ত। জীবনের প্রথম ফাল্গুন।

'খেলবে সাগরদা?'

'কি, ক্যারম্? না থাক।'

কঙ্কা হাসে। বিজয়িনীর হাসি—'কেন, ভয় পেলে তো?'

'তোমাকে ভয়? তুমি তো খেলতেই জানো না।'

'না হয় সেটা স্বীকার করলাম। বেশ, পিংপং খেলবে চলো।' সাগরের হাত ধরে টানতে থাকে কঙ্কা।

'বেশ চলো।'

খেলা চলে। দু'জনেই সমান ওস্তাদ। না পারার আনন্দেই হাসি। মাঝে মাঝে মাথার চুলগুলো সারা মুখ ছেয়ে ফেলে, আংগুল দিয়ে সেগুলো আবার কানের পাশে টেনে নিয়ে খেলতে থাকে কঙ্কা। সাগর এতটুকু নড়ে না। পারলে পারলো নইলে ছেড়ে দিতে

কুণ্ঠা নেই। কঙ্কা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হাঁফিয়ে ওঠে। সাগর বলে—'কেমন হারলে তো।'

'ইস্, হারানো অতো সোজা কিনা। এসো ক্যারম্ খেলি।' কঙ্কা রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিয়ে হাতের ব্যাট নেড়ে হাওয়া খেতে থাকে—'ওসব বাজে খেলা। মেয়েলী ব্যাপার।

'হুঁ।' মৃদু হেসে মাথা নাড়ে কঙ্কা—'আর কেন? বললেই তো পারো, পারি নে।'

'অতো সহজেই হার মানবো ভেবেছো।'

কঙ্কার মা হঠাৎ ঢুকলেন ঘরে। হাতে উলের কাটা! কি যেন বুনছেন।

'শোন সাগর।'

'আমায় ডাকছেন?' একটু মুষড়ে পড়ে সাগর। ভয়ও পায়।

'হ্যাঁ, এসো।' বাইরে এনে সাগরকে বলেন তিনি—'কঙ্কাকে পড়াতে পারবে? সকালে মাষ্টার আসে আর সন্ধ্যায় তুমি এটা ওটা দেখিয়ে দেবে। কোন তো কাজ নেই তোমার। শানু বলে—তুমি ভালো ছেলে, তুমি পারবে।'

রাজী হ'ল সাগর। এক কথায় নয়। অনেক কথার পর।

আবার ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল কঙ্কা—'মা কি বললেন?'

'বললেন—আর এসো না এখানে।'

'সত্যি বলছো? এ'কথা বললেন মা?' কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায় কঙ্কার মুখ।

'না, না।' হেসে ফেলল সাগর—'তোমাকে পড়াতে বললেন?'

'ধ্যেৎ, মিথ্যে কথা।'

'এও মিথ্যে কথা? বেশ, যা সত্য ভাবো তাই বলেছেন।'

'সত্যি, একথা বলেছেন মা ? তুমি পড়াবে আমায় ?'

'হ্যাঁ। এই চুপ, আমি এখন মাষ্টার মশাই জানো ?'

'ভারী তো বিদ্যে। আমিই তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি কতো ?'

'কি শেখাবে ?'

'ক্যারম্।'

দুজনেই হেসে ফেলে।

মাঠের কোণে সাগর আজ একা। কেউ আসেনি। কঙ্কা নিয়মিত নয় কিন্তু নীতা ? সে কেন আসে নি আজ! হয়তো গেছে কোথাও নাচতে কি গাইতে। এমন আমন্ত্রণ প্রায়ই আসে ওর। বড়ো একা মনে হচ্ছে সাগরের। বইটা ভালো লাগছে না, আকাশ বাতাস সবই যেন অসহ্য আজ। নীতা আর কঙ্কা। সাগরের রংগীন কাননে ওরাই ফুল। সাগরের স্বপ্নে ওরাই স্বপ্নমানসী। ভাবতে ভাবতে চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। সবুজ ঘাসে ঘুমিয়ে পড়ে সাগর।

সব সবুজ কালো করে দিয়ে ধীরে ধীরে রাত নামে। সাগর জাগে। বুকের ওপর কিসের এক নরম স্পর্শ অনুভব করে সাগর। অনুভূতি সজীব হয়ে ওঠে। একি ? ওড়না ? সাদা মলমল ? চারদিকে তাকায় সাগর। কঙ্কা তো আসে নি আজ, নীতাও নেই। কার ওড়না ? কে দিলো ? মুড়তে মুড়তে হাতের মুঠোয় টেনে আনে ওটা। বেশ ভালো লাগে এ নরম বস্ত্রখণ্ড। কিন্তু কার, কার জিনিষ। উঠে দাঁড়ায় সাগর। ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

'ওকি সব ফেলে চলে যাচ্ছো সাগরদা।'

'একি, নীতা তুমি ?'

'হ্যাঁ।' নীতা আজ রোজের মতো নয়। কেমন গম্ভীর, অভিমান

ভরা চোখমুখ। এই নিরিবিলি অন্ধকারে আজ ও একা। অবাক হয়ে যায় সাগর।

'রাগ করেছো নীতা।' সাগর ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় ওর ভুল। সহজে হাল্কা হতে চায়—'কেন, কি করেছি আমি, বলো।'

হাসতে চাইল নীতা কিন্তু পারলো না। কান পেরিয়ে এগিয়ে আসা চুলগুলো পেছনের দিকে টেনে বলল সে—'সব পেয়েছো তো? একি শুধু ওড়নাই নিলে আর কিছু না?

'কি বলছো তুমি?' সাগরের কৌতূহল বেড়ে যায়—'এ কার ওড়না?'

'আহা, ছেলেমানুষ তা। কি—কিছুই বোঝ না যেন।' করুণ হাসি—'এসো।'

সাগরের হাত ধরে নীতা এগিয়ে গেলো। সাগর যেখানে শুয়েছিলো এলো সেখানে। কুড়িয়ে নিল একটা আংটি। নীতা তাকাল সাগরের দিকে—'নাও।'

সাগর বিস্ময়—'এ কার জিনিস নীতা।'

'কি জানি।' নীতা আবার ব্যথার হাসি হাসল—'কুড়িয়ে পেলাম।'

'ও তোমার। তুমি পড়ো।'

নীতা কেঁপে উঠল—'না, না এ তোমার। তোমার জিনিস।'

'তোমার কুড়োনো জিনিস আমার হবে কেন?'

'তবু তোমার।'

'আমি বলছি, তবু তুমি পড়বে না নীতা?' অনুরোধ নয়, মৃদু ধমক দেয় সাগর। নীতা চুপ করে থাকে। আংটিটা নিয়ে নিজের হাতেই নীতার আংগুলে পরিয়ে দেয় সাগর। রাত্রির অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে।

নীতার হাতে তখন দুটো আংটি। একটি নিজের, অপরটি ওর নয়। নৃত্যের তালে বরণ মুদ্রায় সাগরের চোখের সামনে হাতটা তুলে ধরলো নীতা। নীরব চোখের চাউনি। এ ওর দিকে চায়—'কোনটা সুন্দর সাগরদা ?'

সাগর হাসে—'তোমারটা শুধু সোনা দিয়ে গড়া আর ওটা নীলা। ওর পাশে সোনার মূল্য কতটুকু, বলো।'

নীতা কেঁপে ওঠে। জলে ওঠে চোখ দুটো। টেনে খুলে ফেলতে চায় কুড়োনো আংটিটা—'আহা, খুলছো কেন।' সাগর বাধা দেয়।

নীতা খুলে ফেলে। সাগরের পায়ে ছুঁড়ে ফেলে। বলে—'না থাক্, ও তোমার। আমার হাতে মানাবে না ওসব।' নীতার চোখে জল দেখে সাগর।

সাগর স্তব্ধ। সব যেন কেমন রহস্য—'তুমি কাঁদছো নীতা ?'

ছুটে পালিয়ে যায় নীতা—'না, না, ও আমার নয়। আমার নয়, যাকে দেবার তাকে দিও। সে সুন্দর।' অন্ধকারে মিলিয়ে যায় নীতা। সাগর দাঁড়িয়ে থাকে, সব কিছুই কেমন যেন আশ্চর্য মনে হয়। পা [illegible]র দিকে। সবুজ ঘাসে পড়ে [illegible] [illegible] ওড়না, [illegible] পড়ে [illegible]।

মাঠের কোণ তবু সবুজই থাকে। কঙ্কা আসে রোজ। আসে, পাশে বসে, কথা কয়।

'নীতা কোথায় জানো।'

'না তো।' কঙ্কা বলে।

'অসুখ করেনি তো ?' সাগর সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়ে—'আচ্ছা কঙ্কা, নীতা রোজ স্কুলে যায় ?'

'যায়।'

যায়? আশ্চর্য, কিন্তু মাঠে আসে না কেন? মনে হয়—সেদিনের সে সন্ধ্যায় যদি মাঠে না আসতো সাগর তবে তো এমনি করে দূরে সরে যেতো না নীতা।

'সাগরদা।'

'বলো।'

'একথা আমায় বলল কেন নীতা?'

'কি কথা?'

'বলল—তুই সালোয়ার পরিস কেন? ভালো দেখায় না। আর যদি পরতেই হয় তবে ওড়না পরিস কেন?'

'হয়তো ওসব ওর ভালো লাগে না এইজন্যে। রেখে দাও ওসব বাজে কথা।'

কথাটা বাজে নয় সাগর জানে। ভাবে, গভীরভাবে ভাবে এ নিয়ে। ভালো লাগে না কিছু। আকাশ বাতাস আজ যেন কেমন হয়ে গেছে—'চলো কল্পা। চলো।' সাগর উঠে দাঁড়ায়।

'এরই মধ্যে যাবে?'

'হ্যাঁ, চলো।'

'চলো!'

প্রদোষ সূর্যের আলো তখন নিভে এসেছে প্রায়। ঘরে শুয়ে আপন মনে বই-এর পাতা উল্টে চলেছে সাগর। মন উদ্‌ভ্রান্ত। কিছুতেই যেন মন বসে না আর। সুখস্বপ্নের শেষে মানুষ যেমন করে পৃথিবীকে দেখে, সাগরের মনে আজ তেমনি অস্বস্তি। কতো রংয়ে রংগীন ছিলো আকাশ, কতো বর্ণচ্ছটায়। আজ সে আকাশে ঝড়ের

সংকেত, বাতাসে ভাংগনের গান। সবুজ মাঠের আকর্ষণ আজ আর নেই। ঘরের কোণে কড়িকাঠ গুনেই দিন কাটে সাগরের। কঙ্কা হয়তো এসে এসে ফিরে যায় রোজ। কিন্তু কি ক'র:ব সাগর? কি করার আছে? বইটা বন্ধ করে চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘুম নেই। খাতাটা টেনে নিল। কিছু লিখতে হবে। লিখবেই। গুটিকয়েক লাইনের একটুকুরো চিঠি। জানাবে—তুমি ভুল করেছো, ভুল বুঝেছো তুমি। সাদা কাগজের ওপর কলমটা চললো কিছুক্ষণ। কিছুই লেখা হল না। মনের কথা মনে বলা চলে, ভাষায় সে অপ্রকাশ্য। মনের অজানিতেই নানা আঁকঝাঁকে পাতাটা ভরে যায়। পেছনের দরজায় কে যেন দাঁড়ালো এসে। সাগর কেঁপে ওঠে—'কে, নীতা?'

পেছনে তাকাতেই লজ্জায় নুইয়ে পড়ে সাগর। নীতা নয়, কঙ্কা।

'মাঠে যাও না কেন সাগরদা?'

'ভালো লাগে না।'

'তাই বুঝি নীতা দেখছিলে?' কঙ্কা হাসলো।

'না, ভেবেছিলাম হয়তোতুমি নীতা। একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো।' কঙ্কা ঢুকলো ঘরে। বিছানো মাদুরের এক কোণে বসলো—'কেন, আমি কি আসতে পারিনে?'

'পারবে না কেন?' শুকনো হাসি হাসলো সাগর—'তবে নীতাই আসে মাঝে মাঝে। তুমি তো এই এলে প্রথম।'

জানলাটা খুলে দিল সাগর। আলো জ্বালল। ঝকমকিয়ে উঠল কঙ্কা। ঝলমলিয়ে উঠল ওর কণ্ঠমালার হীরকখণ্ড, কানের নীলা। শুধু অংগালংকারই নয়, সমস্ত পৃথাই যেন জ্বলছে অন্ধকার আকাশে শুকতারার মতো।

সাগর বসল কঙ্কার পাশে—'নীতাকে দেখেছো আজ।'

'হ্যাঁ, স্কুলে গিয়েছিলো তো।'

'ওকে একটা কথা বলবে কঙ্কা। বলবে আমার হয়ে।'

'কি কথা!'

'বলো, ওর দেওয়া রুমাল দু'টো এখনও আছে আমার কাছে। যত্নে রেখেছি।'

সহসা চমকে ওঠে কঙ্কা—'আমার সেই আংটিটা কোথায় সাগরদা।'

সাগর মাথা নোওয়ায়। অজুহাত খোঁজে। মিথ্যে কথাটা মনের অজানিতেই যেন খসে পড়ে মুখ থেকে—'আছে।'

'কই, দেখি।'

হাসে সাগর—'বলছি তো আছে। কাল কিন্তু নীতাকে বলো কঙ্কা। বলো।'

'বলব।' [illegible] বুকে চেপে [illegible] থেকে বেরিয়ে আসে কঙ্কা। [illegible]

ডাক্তার সুব্রত সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়, অনেক দিনের। এ' কাহিনী তার কাছেই শোনা। ডাক্তার সরকার আবার শুনেছিলেন তার এক রোগীর কাছ থেকে।

ভেবেছিলাম—এ' কাহিনী কোন এক আষাঢ়ে-আসরে শোনা গল্পের মতোই মনের কোণে জমা ক'রে রাখব—কাউকে যদি বলি কোনদিন, মুখোমুখী বলব, সাহিত্য করবো না—এ' কাহিনী তবেই বুঝি মর্য্যাদা হারাবে। সত্য বলে স্বীকারই করবে না কেউ। ভাববে—গল্প। নেহাৎই কল্পনার রংয়ে রং করা কল্পিত আখ্যান।

কিন্তু আমার মতো স্বল্প শক্তিমান লেখকের পক্ষে এ'রকম আত্মসংবরণ সহজসাধ্য নয়। কোন এক সন্ধ্যায় বসেছিলাম কিছু লিখব বলে। কিন্তু নানা ভাবনা চিন্তার পরেও যখন কোন কাহিনী পুরোপুরিভাবে দানা বাঁধতে পারলো না তখনই এ'গল্পটি লিখি। শপথভঙ্গ হলো—কিন্তু জানিনে, এ' সাহিত্যায়নে আদৌ কিছু হলো কিনা।

মনে আছে, গল্পটি সুরু করার আগে ডাক্তার সরকার একটা ভূমিকা করেছিলেন। তিনি তখন কোন এক মফঃস্বল সহরের হাসপাতালে হাউস সার্জ্জেন। জায়গাটা মোটামুটি মন্দ ছিলো না কিন্তু দু'টো বড়ো বড়ো পেপার মিল আর জুট মিল থাকায় বস্তির সংখ্যাও ছিলো অনেক। এ'জন্যে যে তার খুব অসুবিধে হয়েছে তা নয়, তবে এ' বস্তিগুলোর

কল্যাণে এমন একটি কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছেন যা নানা জায়গায় টেবিলে-বৈঠকে শত শত বার শুনিয়েছেন, হয়তো আরও শোনাবেন। আমি সেই একটিবারের শ্রোতা।

সরকারী চাকরী। পুরো তিন বছোর চাকরী করার পর ডাঃ সরকারকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন সরকার। বদলী হবার দিন দশেক আগেই একটা মজার ব্যাপার ঘটে। রাত দুপুরে দু'টো রোগী নিয়ে আসে পুলিস। রক্তারক্তি কাণ্ড। আঘাত গুরুতর না হলেও দু'জনেই অচেতন। সে রাতে ডাক্তার বিশ্রাম পাননি না একফোঁটা।

পরদিন সকালে যখন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর আবার এলেন তখনই ব্যাপারটা শুনলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'আর বলবেন না মশাই। সেই পুরোনো নোংরা ব্যাপার। লোক দু'টো কাজ করে রামজী পেপার মিলে, থাকেও একই বস্তিতে। ওই যে দেখছেন—বিহারী খোট্টাটা—ওর নাম ভিখু। ভিখারীলাল—লোকে বলে ভিখু দস্যি। দস্যিই মশাই, সত্যিই দস্যি। পুলিস রেকর্ডে দেখা যায় পাঁচবার জেল খেটেছে। আমিই তো তিনবার হাজতে নিয়ে গেছি। লোকটা নামকরা গুণ্ডা।'

'আর অন্যজন।' কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করেছিলেন ডাক্তার-সরকার।

'ও তো একটা আস্ত গর্দ্দভ মশাই। ওর নাম মনা। লিকলিকে চেহারা, হাওয়ার ধাক্কায় ঢলে পড়ে আর ওই কিনা যায় ভিখুকে ছুরি মারতে। সাহসটা দেখুন। কিন্তু লোকটা বেশ ভালো। বস্তির এক কোণে থাকে। বিয়ে-থা জীবনে করেনি। সংসার বলে কিছুই নেই ওর। বস্তির লোকে কোনদিন নাকি হাসতেও দেখেনি ওকে, কাঁদতেও দেখেনি, কথাও বলে কালেভদ্রে। লম্বা দাড়ি আর লম্বা চুলওয়ালা

এ' লোকটাকে ক্রিমিন্যাল ভাবা তো দূরের কথা ও যে ছুরি মারতে পারে আমরা তো ভাবিইনি কোনদিন।'

সেদিন রাত্রের ঘটনাটা পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছেই শুনলেন ডাক্তার। সেদিন দোল পূর্ণিমার পরদিন। হোলীর আনন্দে বিভোর ছিলো বস্তি। সারাদিন আবির-রংয়ে মাতামাতি করে কাটিয়ে সন্ধ্যায় একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলো জোয়ান-মরদ লোকগুলো। বস্তির যেখানেই এতটুকু উঠোন পেয়েছে সেখানেই বসে গেছে খোল-করতাল নিয়ে। সঙ্গে বোতল নয়—মাটীর হাড়ি। নেশার সঙ্গে গানের সুর মিলিয়ে বস্তিটাকে যখন একেবারে ওদের মাথায় এনে তুলেছে তখনই ঘটলো ব্যাপারটা।

নেশা করে এতই মত্ত হয়েছিলো ভিখু গানের আসর পর্য্যন্ত ওকে আকর্ষণ করেনি। গানে নেশা না থাকলেও, গঙ্গাধরের বউ যখন জলের কলসী কাঁখে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন বুঝি ওতে নেশা ছিলো কিছুটা। তারপর একটা চীৎকার শুধু। সমস্ত বস্তির ছন্দ কেটে যায়। এক নিমিষে স্তব্ধ হয়ে যায় সব হৈ-হুল্লোড়। ছুটে আসে মানুষ কিন্তু কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়—ভিখু দস্যি। গঙ্গাধরের বউটা যেন চুপসে যেতে চাইছে ওর শক্ত হাতের চাপে। কেউ এগোয় না, ভয় পায়। কিন্তু সমস্ত জনতাকে দু'হাতে সরিয়ে কোত্থেকে যেন ছুটে এলো মনা পাগলা। লিকলিকে চেহারা, হাওয়ার ঝাপটে লুটিয়ে পড়তে চায় কিন্তু আজ ওরই হাতে ছুরি। ভিখুর ঘাড়ের কাছে ওর আঘাতটা লাগলেও, পাল্টা আক্রমণে মনারই বিপদ ঘনালো। কিন্তু রক্তারক্তিটা বেশীদূর এগোলো না। বস্তির আর সব মানুষেরা এগোতে দিলো না আর। পুলিস এলো, দু'জনেই তখন অচেতন।

লোকটার সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ডাঃ সরকার। বেশ কিছুটা

সুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার জিজ্ঞেসও করেছিলেন লোকটাকে—'তুমি ওর সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলে কেন। ওতো নামকরা গুণ্ডা।'

লোকটা এককথায় এর উত্তর দেয়নি। ওর ভয় ছিলো ও বাঁচবে না। তাই বলেছিলো—'মা জাতের বেইজ্জতি আমি সইতে পারিনি ডাক্তার সাব্। সেজন্যেই তো বে করিনি জেবনে। এট্টা কথা বলি ডাক্তার সাব্—'

লোকটা একটা ঢোক গিলে বলল কথাটা। একটা কথা নয়, আধো ভদ্র, আধো পল্লী ভাষায় পুরোপুরি একটা কাহিনীই বলে গেলো ও। জীবনেতিহাস।

কমলপুর থেকে দু'মাইল দূরে মানিকনগর গ্রামে মস্ত একটা হাট বসে শনি-মঙ্গলবারে। ভীড় হয় খুব। আশে-পাশের গ্রাম থেকে লোক ভেঙ্গে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ এসে ভীড় করে এখানে। বেচতে আর কিনতে। তারপর রাত দশটার পর বাজার বন্ধ হয়। কোলাহল থামে। সে এক বিরাট ব্যাপার। শনিবার আর মঙ্গলবারের মানিক নগর—প্রতিবেশী গ্রামগুলোর উপনিবেশ যেন।

মণিলাল প্রত্যেক হাটের দিনে আসে এখানে। কিনতে নয়, বেচতে। নিজের বাড়ীর সামনে যে দু'বিঘে জমি পড়ে আছে সেখানে ও নিজ হাতে বাগান গড়েছে। লাউ, কুমড়োলতা লতিয়ে দিয়েছে বাঁশের মাচার ওপর। সজনে গাছ বুনেছে এক কোণে, অন্য দিকে বেগুনের চারা। মাঠের কাজ সারা বছোর থাকে না, কিন্তু এ'ক্ষেতের কাজ প্রতিদিনের। ফলও দেয় প্রতিদিন। গোলায় তোলা আছে বছোরের ধান আর এ'চিরদিনের সবুজ বাগান দেয় কিছু উপরি উপার্জ্জন। এ'সব নিয়েই বাজারে যায় মণিলাল। এতে বেশ কিছু পয়সা জমে পকেটে।

সেদিন শনিবারের হাট। যথারীতি সারা দুপুর লাউ, কুমড়ো, লেবুর ব্যবসা করলো মণিলাল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার আগেই গুটোতে হলো সব।

আকাশটা ভয়ানক কালো হয়ে আসছিলো ধীরে ধীরে। বাতাসও বইছিলো বেশ জোরে। জ্যৈষ্ঠমাস। কালবোশেখীর নাচন সুরু হ'বে। ভয় পায় মণিলাল। অন্যদিন অবশ্য রাত এক প্রহর না পেরোলে ঘরে ফে'রে না কেউ। কিন্তু আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘরে ফেরা দরকার। আকাশের যা হাল। মনে হচ্ছে, এ'ঝড়-বাদল সহজে কমবে না। পথও তো একটুখানি নয়, পুরো এক ক্রোশ। কমলপুর থেকে আর যারা আসে, তারা প্রায় সবাই চলে যায় বিকেল নাগাদ। কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ হেঁটে। যারা মণিলালের মতো জোয়ান-মরদ শুধু তারাই পা নাড়ে না। চোর-ডাকাত আর ভূতের ভয় তাদের কম। কিন্তু একে একে সবাই চলে যাওয়ায় মণিলালও রইলো না আর। সব গুছিয়ে নিল। তারপর পা বাড়ালো গাঁয়ের দিকে। একা একাই।

সন্ধ্যা হ'তে তখনও অনেক দেরী। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল বুঝিবা রাতের প্রথম প্রহর তখন। চারদিক অন্ধকার, বোশেখী ঘূর্ণীর ধুলোয় আচ্ছন্ন ধূ ধূ মাঠ। দূরে, বহু দূরে মু'ছে গেছে গ্রামান্ত রেখা। কালো হয়ে গেছে পৃথিবী। আকাশও উন্মাদ। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমক, মেঘে মেঘে ধাক্কা। সমস্ত আসমান জমিন কাঁপিয়ে তোলা গুরুগর্জ্জন। যেন মস্তো দু'টো মোষ ফুঁসছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। লম্বা লম্বা পা ফেলতে সুরু ক'রলো মণিলাল। এই ঝড়ের মধ্যেই ওকে ফিরে যেতে হবে। পুরো এক ক্রোশ পথ চলতে হবে। সরাসরি সরকারী পথ ধরলো না মণিলাল। ওটা ঘুরপথ। কোণাকুণি আলপথ নিলো। চওড়া পথে গরুর গাড়ী চলে, মানুষও যে চলে না,

তা নয়, তবে ঘুরতেও হয় তেমনি। প্রায় দৌড়োতে সুরু করলো মণিলাল। দেউলার মাঠের সীমানা পেরোনোর পরই সুরু হবে সোনাগাঁ। ব্যস্, ও'টুকু পথ যেতে পারলেই আর কোন ভয় নেই ওর। তারপরই তো চরনিশুন্দির মাঠ। তারপরই ওর নিজের গ্রাম—কমলপুর। এ'টুকু পথ চোখ বুঁজে পেরিয়ে যাবে ও। একটা দৌড় দেবে শুধু।

কিন্তু পারলো না মণিলাল। দেউলার মাঠ পেরোনোর আগেই অতর্কিতে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি সুরু হলো। শিলাবৃষ্টি। এ'বারে সত্যি বিপদে পড়লো ও। মাথার ওপরে বোঝা নিয়ে আর এগোতে সাহস পেলো না। সের দুয়েক বেগুন আছে এখনও, কিছু লঙ্কা, দু'টো কুমড়ো। জলে ভিজে পঁচে যাবার ভয়। তা'ছাড়া বড়ো ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। সমস্ত শরীর শির শির ক'রে কাঁপছে রীতিমতো। সূঁচের মতো ফুটছে ঠাণ্ডা হাওয়া। পুরো দেড় মাইল ঝড়-বাদল সয়ে আসতে হয়েছে ওকে। আর নয়, এ'বারে আশ্রয় খুঁজলো মণিলাল। কিন্তু যা'বে কোথায়, কোন চুলোয়? চারদিকে তো শুধু মাঠ। লোক নেই, জন নেই তো ঘর থাকবে কোথায়? মাঠের মাঝখানে অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাতে সুরু করলো মণিলাল। বুদ্ধিও খুললো শেষে। ওই চরকতলার টিপিটা বাঁয়ে রেখে বাঁক ঘুরলেই বাবুদের বাগান বাড়ী। ব্যস্, আবার চলতে সুরু করলো মণিলাল। ঝড়-বাদলে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চললো সেদিকে।

'বাবুদের বাগানবাড়ী' অর্থাৎ জমিদার চন্দ্রবাবুর প্রমোদাগার ছিলো এ'টি। বসতবাটী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। কতো কুৎসা, কতো অপপ্রবাদ জড়িয়ে আছে এ'বাড়ীর সঙ্গে। এককালে নাকি বিচিত্র ছিলো এর রূপ। চারদিকে ফুলবাগিচা, দেশী বিলিতি ফুলের বাহার আর

মাঝখানে ছোট একটা বাড়ী। নামে বাগান বাড়ী হলেও, এটা নাকি আসলে ভাড়াটে বাঈজীদের আস্তানা ছিলো—লোকে তাই বলে। সে'সব পুরোণো কথা। সে রাজ্য আজ ইতিহাস হয়ে আছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে সব হারিয়েছে চন্দ্রকান্তবাবুর ছেলেরা। সবাই সহরে থাকে আজকাল। সে বাগান বাড়ী আজ চুণ সুরকী খসে যাওয়া হাড় জিরজিরে কঙ্কাল, গুল-বাগিচায় ফণি-মনসা আর আগাছার ঝোপ।

মণিলাল অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকেই মাথার বোঝাটা নামালো মাটীতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। পরিপূর্ণ আরামের শ্বাস। ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার, একটা চামচিকে হঠাৎ কিচির মিচির ক'রে স'রে যায় এ' কোণ থেকে ও' কোণে। টিকটিকি ডাকে একপাশে। সত্যি একটা ভূতুরে বাড়ী যেন। না, এ অন্ধকারকে ভয় করে না মণিলাল। ভূতকেও না। কোমর থেকে গামছাটা খুলে ভেজা শরীরটা মুছে নেয় ভালো ক'রে। গুণগুনিয়ে গানও গেয়ে ওঠে।

কিন্তু—

চমকে ওঠে মণিলাল। ও স্পষ্ট বুঝতে পারে—এ'ঘরে ও একাই নয় শুধু, দ্বিতীয়জন আছে কেউ। গামছাটা আবার ভালো করে কোমরে আঁটে ও। ঝড়ের দাপটে ভাঙা দরজাটা দাপাদাপি করে। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দেয় মণিলাল। ঘরে স্তব্ধতা আনে। কিন্তু কে যেন কঁকিয়ে ওঠে হঠাৎ। কান্না নয়, তবু একটা ভীত আর্তনাদ।

'কে?' ব্যস্ত হাতে দেশলাই জ্বালে মণিলাল। ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায়। চমকে ওঠে—এ' কোন মেয়ে। মেয়ে না বউ? কাপড়ে জড়ানো একটা পুটলীর মতো পড়ে আছে ঘরের কোণে।

'কে গা তুমি? কার মেয়ে।' অন্ধকারে কয়েক পা এগোলো মণিলাল। আবার একটি চামচিকে চিঁচিঁ করে উঠলো।

মেয়েটি যেন আরও ভয় পেলো। চীৎকার করে উঠলো। বুঝলো মণিলাল—ভুল হয়েছে ওর। এই ভরসন্ধ্যায় একটি জোয়ান মানুষ আর একটি সোমত্ত মেয়ে, শুধু দু'জন, নির্জ্জন এ' পোড়ো বাড়ীতে—না, ভয় পাবারই কথা। পিছিয়ে এলো মণিলাল। ঘরের অন্যকোণে সরে এসে দাঁড়ালো। বললো—'উদিক থেকে সরে এসো এট্টু। জলের দিনে সাপ বেরুতে পারে।'

অন্ধকারে বুঝলো না মণিলাল ওর কথা শুনলো কিনা মেয়েটি। সত্যি সরলো, না ও'খানেই রইলো পড়ে। নীরব মুহূর্ত কাটে। বাইরে ভীষণ ঝড় তুফান, ভেতরে অন্ধকার। হাসি পেলো মণিলালের। হয়তো খুব ভয় পেয়েছে মেয়েটি। আচ্ছা, একটা মজা করলে কেমন হয়। মনে মনে ভাবে মণিলাল। যদি একটা বিড়ি ধরায় ও। তারপর যদি একপা দু'পা ক'রে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় কোণের দিকে। পায়ের শব্দে না হোক, বিড়ির আগুন দেখে তো অন্ততঃ বুঝবে মেয়েটি, প্রতি পদক্ষেপে ওর দিকেই এগোচ্ছে পুরুষটা। চীৎকার করবে? কাঁদবে? কাঁদুক। কে শুনবে ওর কান্না। ঝড় বাদলে নিজের কথাই নিজের কানে এসে পৌঁছোয় না। ওর কান্না শুনবে কে? অবশ্য সত্যি সত্যি কোন উদ্দেশ্য নেই ওর। ছিঃ, ও'সব পাপ। ভাবতেও সারা শরীর কেমন যেন শিউরে উঠলো ওর। এ'সব কথা কি করে মনে আসে মানুষের। তা'ছাড়া খুব শিগ্গীরই ডাগোর ডোগোর একটা বউ আসছে ঘরে। পাণিডাঙ্গার লক্ষীন্দর মণ্ডলের ছোট মেয়ে। বেশ দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন গিয়ে দেখে এসেছে মণিলাল। প্রথম দিনেই রং ধরেছে মনে। কাকাকে পাঠিয়েছে জোর করে—ওর হয়ে লক্ষীন্দরকে পাকা কথা দিয়ে আসতে। মনে মনেই হাসলো মণিলাল—কে না কে। কার না কার বউ, তার জন্যে ভাবতে ভারী বয়ে গেছে ওর।

বাইরের ঝড় থামেনি তখনও। পুরোদমে চলছে বর্ষার মাতলামী। অগত্যা ঘরের একপাশে সরে এলো মণিলাল। বিড়ি ধরালো না। থাকগে। কাজ কি মেয়েটাকে অনর্থক ভয় দেখিয়ে। তার চেয়ে এখানে এই ইঁটের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমোনো যাক একটু। সন্ধ্যা উৎরে যায়—যাক, রাত হয়—হোক। বৃষ্টি থামলেই আবার গাঁয়ের দিকে পা বাড়ানো যাবে। পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুঝলো মণিলাল।

ঘুম না এলেও বেহুঁস হয়ে পড়েছিলো ও। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কোন হদিসই ছিল না আর। হঠাৎ দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে উঠে বসলো। বাইরে বৃষ্টির শব্দ এত প্রবল যে দরজায় লাথি না পড়লে কেউ শুনবেই না ভেতর থেকে। সত্যি কে যেন উন্মত্তের মতো লাথি মারছে দরজায়।

'কে, কে তুমি।' তাড়াতাড়ি ছুটে যায় মণিলাল। কাঠের দরজায় কান পাতে।

'আগে দোরটা খোলই না বাপু। জলে যে নে গেনু।'

খিলটা খুললো মণিলাল। এক ঝলক পাগলা বাতাস এসে ঢুকলো ভেতরে আর সে'সঙ্গে বেঁটে গোছের একটা মানুষ। একটা পাটের বস্তায় পিঠ ঢেকে, মাথায় তালপাতার মাথলা চাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকলো। অন্ধকার, মিশ্‌মিশে কালো অন্ধকার। ভেতরে বাইরে, সর্বত্র। মুখ দেখে চেনা সম্ভব নয়।

'কে গো তুমি। কোন গেরাম?' প্রশ্ন করলো মণিলাল।

'নাম অর্জ্জুন বাড়ুই। নিবাস কমলপুর।'

'আরে, অর্জ্জুন খুড়ো। তুমি ইদিকে?'

'কে মনা না?'

'হুঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মণিলাল—'তা তুমি ইদিকে কেন?'

'এই এইছিলাম এট্টু গরুটার খোঁজে। মাঠ থেকে নে ছিনাথ বেঁধে রেখেছে ওর গোয়ালে। কাল সকালে দেবে বলছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে মাথার মাথলা নামালো অর্জ্জুন বাড়ুই। পিঠ থেকে জলে ভেজা বস্তাটাও সরিয়ে নিলো—'উঃ, কি হয়রানীই না হলো। সারা গেরাম পঁই পঁই করে ঘুরছি। হাঁরে মনা—বিড়ি-টিড়ি আছে রে?'

'ধরো।' কোমরের কাপড়ে লুকিয়ে রাখা বিড়ি বের করে দিলো মণিলাল। দেশলাইটাও।

একটা কাঠির এককণা আগুনেই ঘরে বেশ একটু আলো হলো। সে আগুনেই ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা মেয়েটাকে দেখলো অর্জ্জুন। বিড়ি ধরানো হলো না আর। ঠোঁট থেকে বিড়িটা নামিয়ে বাঁকা চোখে তাকালো মনার দিকে—'ও কে রে মনা।'

'জানিনে।'

'জানিসনে।'

'উহুঁ।'

সে'কাঠিটা নিভে গেলে আরেকটা কাঠি জ্বালালো অর্জ্জুন। একটু একটু করে এগিয়ে গেল ওদিকে—'কে মা তুমি। কার মেয়ে, কার বউ?'

সাড়া নেই। মেয়েটি যেন আরও ভয় পেলো বেশী। কাপড় দিয়ে সারা শরীর ঢাকলো ভাল ক'রে।

'আহা, লজ্জা কি? আমি তোমার বাপের বয়সী। এই রাত বিরেতে যাবে কেমন করি—' একটু একটু করে মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অর্জ্জুন। পেছনে পেছনে মণিলাল। বারবার একই অনুরোধ করলো অর্জ্জুন, একই প্রশ্ন শুধোলো। হয়তো নিরুপায় হয়েই মাথার

কাপড়টা একটু সরালো মেয়েটি। চমকে উঠলো দু'জনেই। দেশলাইয়ের কাঠিটা খসে পড়লো অর্জ্জুনের হাত থেকে।

প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠলো মণিলাল—'কাকিবউ তুই ?'

আর সে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো কাঠের দরজায়। ঝড়ের ঝাপটে নয়, অন্ধকারে গা ঢেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে অর্জ্জুন। ছুটে বেরিয়ে এলো মণিলাল। গলা ছেড়ে হাঁক দিলো—'ও অর্জ্জুন খুড়ো শোন, শোন, আরে শোনই না এট্টু।

অর্জ্জুন তখন অনেক দূরে। শিলাবৃষ্টি মাথায় বয়ে, এই ভরা দুর্য্যোগের রাতে মিলিয়ে গেলো চড়কতলার বাঁকে। আবার ঘরে ফিরে এলো মণিলাল। আবার একটা চামচিকে চেঁচিয়ে উঠলো ঘরের কোণে। কি যেন একটা চাঁচঁ করে ছুটে গেলো এ' কোণ থেকে ও' কোণে। ছুঁচো নয়তো চিঁচকে ই দুর।

জল-ঝড়ে আশ্রয়ের জন্য 'বাবুদের বাগানবাড়ীতে' উঠলেও এবার আর অন্য কোথাও উঠল না অর্জ্জুন বাড়ুই। ভরা দুর্য্যোগের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে চলে এলো কমলপুরের দক্ষিণ পাড়ায়। পুকুরের ধার ঘেঁসে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লো—'শিবে, ও শিবে, ঘরে আছিস্।' ঘরেই ছিলো সদাশিব। হুঁকো হাতে বেরিয়ে এলো দাওয়ায়—'কে গো এত রাতে।'

'আমি রে, আমি। অর্জ্জুন বাড়ুই।' এগিয়ে এলো অর্জ্জুন।

'তা এসো এসো। এমন দিনে কি মনে করি খুড়ো।' কাঠের পিঁড়িটা পেতে দিল সদাশিব। হুঁকোটা এগিয়ে দিলো হাতে।

বসতে বসতে বললো অর্জ্জুন—হ্যাঁরে শিবে, আমরা কি কেউ নই

নাকি রে, অ্যাঁ। চুলে তো পাক ধরেছে। কথা না শুনিস, আরে মান্যি করবি তো এট্টু।'

'বলি, বেপারটা কি। সেইটে বল দিনি আগে।'

'তোর বউ কোথা রে শিবে।'

'কেন, ও কথা কেন খুড়ো?'

অবাক হয়ে ওঠে সদাশিব—'ওতো ঠাকুরবাড়ী গেছে। মা কালীর থানে।'

বছোরের একটি সময়ে এ'গ্রামের সব গৃহবধূরাই যায় সদানন্দ ঠাকুরের কালীমন্দিরে। যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ 'ভদ্দরলোক' আছেন তাঁরাই শুধু নন, চাষী-জেলেরাও আসে। নিজেদের জন্যে নয়, ভাবী সন্তানের মঙ্গলের জন্যে, মাতৃত্ব নেবার আগে একবার এসে সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রণামী জানিয়ে যায়। এটাই প্রচলিত রীতি। বহুদিনের প্রথা।

'হুঁ।' হুঁকোটা হাতের তালুতে মুছে নিয়ে একটা টান টানলো অর্জ্জুন—'তা তুই ছিলি কোন চুলোয়। সাথে যাসনি কেন।'

'হাটে গেছুনু যে।' বিচলিত হয় সদাশিব। ভয় পায়—'অমন কথা কও কেন খুড়ো। কোন বেপদ-আপদ হয়নি তো।'

ঘাড় নাড়লো অর্জ্জুন বাড়ুই—'আর বেপদ, কি হতে বাকী আছে সেইটে বল দিনি।'

'কেন।' প্রায় আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে সদাশিব।

সদাশিবের কানের কাছে মুখটা টেনে আনলো অর্জ্জুন। বিড়বিড় করে বললো যেন কি। হয়তো বিষ ঢেলে দিলো।

'অ্যাঁ।' লাফিয়ে ওঠে সদাশিব। ওর চব্বিশ বছোরের যৌবন যেন

আগুনের হলকায় তেতে উঠলো হঠাৎ—'তুমি বলো কি খুড়ো, আমাদের মনা ?'

'বুড়ো না হয় হয়েছি তবু এট্টু আজ্জু তো দেখতে পারি আজও। ছানি তো পড়েনি চোখে।' নির্ব্বিকার মনে আবার হুঁকোর ফুটোয় ঠোঁট আটকালো অর্জ্জুন। কয়েকটা জোর টান টানলো। দরজার কোণে কোথায় যেন টিকটিকি ডেকে উঠলো একটা। মাটিতে তিনটে টোকা ঠুকে বললো—'সত্যি, সত্যি, সত্যি। অর্জ্জুনের কথা কি কখনও মিছে হতি পারে।'

বাইরে তখনও অবিশ্রান্ত বাদল ঝরার ঝরঝরানি। ঝরছে, শুধু ঝরছেই। পাগলের মতো অর্জ্জুনের হাতটা সহসা চেপে ধরে সদাশিব। সমস্ত শিরা-উপশিরায় তখন ওর আদিম হিংস্রতা। চোখ লাল—'শোন খুড়ো এ অনাচ্ছেষ্টি আমি সইব নি। লা, লা, কিছুতেই লয়। তোমরা মান্তি জন, এর বিহিত করো আর না করো তো ও মাগীর একদিন কি আমার একদিন। আর ও শয়তান, শালা শূয়োরের বাচ্চা মনার পান লেব আমি। আমার বউর কু করবে। আমি সইবনি। কেন সইব ?' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সদাশিব। উঠে দাঁড়ায়।

'আরে বস্ বস্।' হাত টেনে আবার ওকে বসাতে চাইলো অর্জ্জুন। বললো—'আরে, আমি তো মরিনি এখনও। কি বলিস্ ? আমি ছাড়াও গায়ে তো আরও দশজন আছে, বল আছে কিনা ? তবে, তবে তোর ভয়টা কি শুনি ? বিহিত এট্টা হবেই। এ' অনাচার আমরাও সইবনি।' তারপর হুঁকোর ফুটোয় আবার চুম্বন।

হঠাৎ।

দু'জনেই চমকে ওঠে। পেছন ফিরে তাকায়। ঝোপঝাড়ের অন্ধকার কোণ থেকে কার যেন পদচারণা কানে এসে বাজে। তেজা

কাপড়ের ছপছপানি। গুটি গুটি পায়ে, ভীত, নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক অবগুণ্ঠিতা ছায়াশরীর। দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সদাশিব। চোখের একটা পলক ফেলার ফাঁকে হিংস্র আর ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো ছুটে গেলো ও। ঝাপিয়ে পড়লো। মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিলো বনশিউলির ঝোপের ওপর—'হারামজাদী, এক মিনসে যদি মন ভরতে না পারে তো ঘর করার সখ কেন?'

আকাশ বিদীর্ণ করা, বুকের পাঁজর ভাঙ্গা একটা আর্তনাদ ফেটে পড়লো হঠাৎ।

ছুটে এলো অর্জুন—'হ্যাঁ শিবে, তুই মানুষ না কি? ওতো মেয়েমানুষ। পোয়াতী।'

'তা হোক।' সদাশিব দু'হাতে সরিয়ে দেয় মোড়লের হাত—'অমন নষ্ট মাগীর মরণ ভালো। তুমি যাও খুড়ো। যাও।' আবার একটা লাথি, আবার একটা চীৎকার।

'থানা সেপাই আছে শিবে। মোড়লদের পঞ্চাইৎ আছে।' কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ অর্জুন টেনে আনবার চেষ্টা করে জোয়ান সদাশিবকে।

'তুমি সরো খুড়ো, সরো। থানা সেপাই হবে মনার জন্যি। এ' মাগীর মরণ হোক আগে।'

কিন্তু অর্জুন বোধ হয় অতোটা নির্দয় হতে পারলো না। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও সদাশিবকে টানতে শুরু করলো—'আয় শিবে, আয়। কাল সকালেই বিহিত হবে এর। তুই আয়।'

'না, না খুড়ো। এ'সইবার নয়। আমি বেচার চাই, নইলে মনার পান লেব আমি।'

'হবে, হবে, বেচার হবে। সব হবে। তুই আয়।' টানতে টানতে সদাশিবকে অনেক দূর টেনে নিয়ে এলো অর্জুন বাড়ুই।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সদাশিবও এলো কিছুদূর। পেছনে তখন করুন ক্রন্দন, অসহ্য যন্ত্রণা, কাদার ওপর লুটোপুটি, কাতরানি, মধ্যে মধ্যে বুকফাটা চীৎকার। কিন্তু কে শুনবে সে চীৎকার? লোকে ভাববে—ঝড় বাদলের ঝিরঝিরানির সঙ্গে এ যেন কোন নতুন সুরের সংযোজন। সঙ্গত। আর সেই মুহুর্মুহু আর্তরব বুঝি কোন বিপন্ন নিশাচর পাখীর। শুধু দুটি মানুষ, দুটি নিষ্ঠুর পুরুষ—এ' কান্নার খবর জানতো যারা, তারা অনেক দূরে। ভরত মণ্ডলের বাড়ীর সামনে বুড়ো বটগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মন্ত্রণা আঁটছিলো—মেয়েটা যদি মরে মরুক, কিন্তু মনাকে সাজা দিতে হবে। যেমন করে হোক দিতেই হবে। থানা সেপাই করার আগে পঞ্চাইৎ আছে। গ্রামদেশের বেসরকারী আদালত।

উত্তরপাড়ার গাছের শাখায় দোল দেওয়া বাতাস দক্ষিণপাড়ার পত্র পল্লবকে মর্ম্মরিত করার অনেক আগেই ঘরে ঘরে, কানে কানে, মুখে মুখে ছড়ালো কথাটা। সমস্ত গ্রাম সচকিত হয়ে উঠলো হঠাৎ। মেয়েরা কানাকানি করলো—'ছিঃ, ছিঃ, এত কুবুদ্ধিও ছেল কাঞ্চীবউর পেটে। মাগো, পেত্তি জ্বলে।' পুরুষেরা বাহাবা দিলো অর্জ্জুনকে—'মোড়লের মতোই একটা কাজ করলো বটে নোকটা। এতবড়ো এট্টা অনাছেষ্টি আর চক্কান্ত ফাঁস করে দেল। ধম্মো রাখল বটে।' রাতারাতি ঘরে ঘরে প্রচার করলেও মণিলালকে কিন্তু এ' সবের কিছুই জানালো না অর্জ্জুন।

মণিলাল জানলো পরদিন সকালে।

ঘুমভাঙ্গার পর প্রতিদিনের প্রভাতী কাজগুলো সারছিলো মণিলাল। গরুগুলোকে ভুসি খাইয়ে দুধ দোয়ানোর কাজ। সঙ্গে জোগান দিচ্ছিল ছোট ভাই হারু। বাছুর ধরছিলো। তারপরই আবার লাঙ্গল নিয়ে বেরুতে হবে জোয়ান দুই ষাড়ের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই হুড়মুড়

করে বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়ালো গাঁয়ের মোড়লেরা। অর্জুন, পঞ্চানন, দয়াল, ভৈরব আরও অনেকে। সঙ্গে সদাশিব। ক্রুদ্ধ চোখ সকলের, যেন টিকের মুখে এককণা আগুন।

একসঙ্গে এতগুলো লোক দেখে প্রথম একটু বিস্মিতই হলো মণিলাল। তারপরই এগিয়ে এলো হাসতে হাসতে। বিনীত ভঙ্গীতে —'কি গো, এই সাতসকালে আমার ঘরে কেন। কি মনে করি।'

'শালা, তোর পান লিতে এইছি আমরা।' তেড়ে এলো সদাশিব। চোখেই শুধু আগুন নয় ওর। দাঁতও কটমট করছে।

এবারে বুঝলো মণিলাল। ব্যাপার গুরুতর। গম্ভীর হয়ে বললো— 'কিরে শিবে, পাগল হলি নাকি, হল কি পষ্ট বল।'

'বলাবলির আর কি আছে শালা।' এবারে বুঝি সত্যি তেড়ে আসছিলো সদাশিব। অর্জুন পথ আগলে দাঁড়ালো। চোখের ইসারা দিল পঞ্চাননকে।

এগিয়ে এলো পঞ্চানন। এ'দিক ও'দিক তাকিয়ে বলেই ফেললো সাহসে ভর করে—'গায়ের লোকের চোখকে আর ক'দিন ফাঁকি দিবি মনা? এবার আর লয়। আমরা সব জেনেছি। তোর বেচার হবে আজ।'

'বেচার! কার বেচার করবে তোমরা?' মণিলাল সবিস্ময়ে তাকায়।

'শালা, ল্যাকামো হচ্ছে।' সদাশিব আবার গা ঝাড়া দেয়—'শালা, তোর বেচার।'

গোড়া থেকেই সদাশিবের ব্যবহার বড়ো অসহনীয় মনে হচ্ছিলো মণিলালের। এ'বারে ও ধৈর্য্য হারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—'না, আমি মানব নি তোদের বেচার। অল্যায় তো আমি করিনি।'

'পরস্ত্রীরির সাথে পেড়িত বুঝি অল্যায় লয়?'

'দিবে।' সহসা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে মণিলাল। সে গর্জ্জনে বুঝি উপস্থিত জনতাই শুধু নয়, আকাশও প্রকম্পিত হয়।

সদাশিবও ততোধিক উত্তপ্ত আজ। বলে—'কাল রাত্তিরে তোকে আর কাঞ্চিবউকে দেখেনি অর্জ্জুন খুড়ো? বল্ দেখেনি।'

'দেখেছে তো হয়েছে কি?' মণিলাল সক্রোধে চোখ ফেরালো অর্জ্জুনের দিকে—'কি খুড়ো, চুপসে গেলে যে বড়ো। বলো, কি দেখেছো।'

'অমন সাঁঝের আঁধারে বাবুদের বাগান বাড়ীতে কেন যাওয়া বাপু। বুড়ো না হয় হয়েছি। তাই বলে বুদ্ধি তো খোয়াইনি।'

'তোরা ইতর, শালা হারামীর জাত তোরা।' মণিলালের প্রচ্ছন্ন আক্রোষ যেন ফেটে পড়লো হঠাৎ। মাটী খুড়বার লোহার শাবলটা ঘর থেকে টেনে নিয়ে এলো ও—'বেরো, বেরো যতসব'—

কেঁপে উঠলো লোকগুলো। গাঁয়ের মোড়ল যারা, গাঁয়ের যারা মাথা তাদের যে এমন করে অপমান করবে সেদিনের এই একফোঁটা ছোকরা অতোদূর ভাবেনি কেউ! এ' ঔদ্ধত্যকে প্রতিরোধ করতে অবশ্য সক্রোধে এগিয়ে এসেছিলো সদাশিব, মংলা আর হরিধন কিন্তু অর্জ্জুন ওদের দু'হাতে আগলে রাখলো। বুড়ো বলেই হয়তো ওদের ভয়টা একটু বেশী, মারপিট না হয় জোয়ানরাই করলো কিন্তু শক্ত শাবলের একটা আঘাত হঠাৎ যদি ছিটকে এসে পড়ে তবেই তো হাড় চুরমার। কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে তবু। নইলে মান থাকে না। বৃদ্ধের মর্য্যাদা; মোড়লের মান।

'পঞ্চাইতের বেচার না মানলে কিন্তুক তোর বেপদ হবে মণা।' অর্জ্জুন গর্জ্জায়।

'সে আমার হবে, তোমার কি?'

'আচ্ছা, দেখে লেব।' অর্জ্জুন মোড়ল সকলকে ফেরবার ইঙ্গিত করে। ক্রুদ্ধ চোখে মণিলালকে দগ্ধ করায় চেষ্টা করে সবাই। কিন্তু ইঙ্গিতে পিছু হটতে হয়।

শুধু সদাশিবই চুপ থাকতে পারে না। যাবার আগে শেষ কথা বলে যায়—'শালা, তোর পান লেব পরে—আজ মরণ হবে তোর রংয়ের মানুষের। ও'মাগীর চেতায় আগুন জ্বালবনি আমি। তুই-ই যাস।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অর্জ্জুন মোড়লের দল।

এরপরও কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মণিলাল। সব কিছুই কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে ওর। পাপ? অন্যায়? অপরাধ? না, না, কি ক্ষতি করেছে ও? কার ক্ষতি করেছে। তবে কেন শুনছে না ওরা। অসহায়ের মতো উপায় খোঁজে মণিলাল। পায় না। কাঞ্চিবউর দোষ নেই, কোন কলঙ্ক নেই মেয়েটার? তবে কেন মেয়েটা কষ্ট পাবে সদাশিবের হাতে।

সদাশিব। মনে হতেই শিউরে উঠল মণিলাল। কে জানে—হয়তো মেরেই ফেলবে মেয়েটাকে। না, না, সে হতে পারে না। হতে দেবে না মণিলাল। মিথ্যে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবে মেয়েটাকে। ওর জন্যে মরবে একজন। কেন, সে পাপের বোঝা বইবে কেন ও? মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলে মণিলাল। যাবে সদাশিবের কাছে। লাঠি সড়কী নিয়ে নয়—শুধু হাতে যাবে। হাত ধরে বোঝাবে—এ' সব অর্জ্জুন খুড়োর শয়তানী। পঞ্চায়েত হারামী। দোষ নেই কাঞ্চিবউর, ওকে যেন ক্ষমা করে সদাশিব।

আর সঙ্গে নেবে—কালকের হাটে উপার্জ্জিত নগদ তিনটে টাকা।

সদাশিবের হাতে দিয়ে বলবে—'এ' আমার পায়চেত্ত নয় শিবে, পায়চেত্ত নয়। এমনি দে—বউকে এট্টা শাড়ী কিনি দিস্।'

•

সেদিন সন্ধ্যায় সদাশিবের উঠোনে এসে দাঁড়ায় মণিলাল। বেড়ার ঘর, ছনের ছাদ। বাইরে জমাট অন্ধকার, ভেতরেও আলো আছে কি নেই বোঝা যায় না ঠিক। উঠোনে দাঁড়িয়ে সদাশিবকে একবার ডাকবে ভেবেছিলো কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠলো মণিলাল। ভেতরে কার গোঙানী যেন, কার কাতর ক্রন্দন। কাঞ্চিবউ! কাঞ্চিবউ কাঁদছে! শব্দ করলো না মণিলাল। পা টিপে টিপে উঠে এলো দাওয়ায়। চোরের মতো চুপে চুপে উঁকি দিলো বাঁশবেড়ার ফুঁটো দিয়ে। শিউরে উঠলো মণিলাল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেলো—মাটীর ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে কাঞ্চিবউ। দাপাদাপি করছে। জলে ভেজানো বিচুটি পাতা ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন ঘসে দিয়েছে কেউ। আলুথালু চুল, চোখের জলে ভিজে গেছে মাটীর দাওয়া। অমন সুন্দর মুখে সেই কাদামাটীর লেপন। বুক থেকে সরে গেছে শাড়ী, ওদিকে হাঁটুর ওপরে উঠেছে গোঁড়ালীর কাগড়। দু'হাতে পেট আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে মরছে। হঠাৎ কিসের ব্যথায় যেন কঁকিয়ে উঠছে, চীৎকার করে উঠছে আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মিশে যাচ্ছে কান্নার সঙ্গে। একটানা কান্না। কেউ শুনছে না, সমবেদনা, সান্ত্বনার লোক নেই কেউ।

চোখ সরিয়ে আনলো মণিলাল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। সদাশিবের ওপর প্রচ্ছন্ন ক্রোধটা আরও যেন তীব্র হয়ে উঠলো। হারামজাদ। বউটাকে যেন সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে চায়। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে সদাশিব। কাঠের দরজা নয়, শেকল

নয়, বাঁশের ঢাকনা। বাইরে থেকে একটা লম্বা বাঁশ ডালে-বাঁধা ছড়ানো। বাইরের মানুষ ঢুকতে পারে, ভেতরের মানুষ বন্দী।

মণিলাল পারলো না দরজাটা খুলতে। ছিঃ, একটু আগে বেড়ার ফুটোয় যে ভাবে পড়ে থাকতে দেখলো কাঞ্চিবউকে এর পর আর ভেতরে ঢোকা যায় না। কিন্তু কাঁদছে মেয়েটা, অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এখনও। খুব সরু গলায় ডাকলো মণিলাল—'কাঞ্চিবউ।'

সাড়া নেই। গোঙানী আর ছটফটানি।

'কাঞ্চিবউ আমি। দোর খোল।'

তবু চুপ।

'আমি বউ। আমি মনা, মণিলাল!'

'কে?' হঠাৎ যেন চমকে উঠলো ভেতরের মেয়েটি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জরিত কণ্ঠ—'কে?'

'আমি।' দরজা ঠেলে সশরীরে ঢুকলো মণিলাল। ততক্ষণে টেনেটুনে নিজেকে বিন্যস্ত করেছে কাঞ্চিবউ।

ভালো করে পুরুষটিকে দেখে নেবার চেষ্টা করলো কাঞ্চিবউ। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসতে চাইলো। পারলো না, ঢলে পড়লো আবার—'জল, এট্টু জল।'

এক পলকে চার দিক দেখে নিলো মণিলাল। কুঁজো-কলসী কিছু নেই। ছুটে গেলো পাশের ওই খড়ের ছাউনী দেওয়া ঘরটায়। ওটাই ওদের রান্নাঘর। নিয়ে এলো ঘটিভরা জল—'লে বউ, জল।'

বহুকষ্টে পাশ ফিরে শুল কাঞ্চিবউ। হাঁ করলো ছোট। কিন্তু হাতে জল ঢালতে সুরু করলো মণিলাল। ঘটি উপুর করে ঢেলেই চললো। কাঞ্চিবউর কণ্ঠনালী দ্রুত ওঠানামা করে। যেন কোন চাতক

পাখী প্রথম বর্ষার জল পান করছে কণ্ঠ ভরে। দেখে করুণা হলো—'শিবে তোকে খুব মেরেছে, নারে বউ।'

প্রত্যুত্তর নেই। কাঞ্চিবউর এ'তৃষ্ণা যেন মিটবার নয়। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করলো না মণিলাল—'আমি ছাড়া আর কেউ তোর বেথা বুঝবেনি বউ। ওরা মানুষ লয়, জানোয়ার। দত্যি। তুই তো জানিস বউ, আমার দোষ লেই, তোর লেই।'

বাঁ-হাতে আলতোভাবে ঘটিটা সরিয়ে দিলো কাঞ্চিবউ। তারপর আবার পাশ ফিরলো। যেন মণিলালের কথাগুলো কানেই যায়নি ওর।

'বউ, তোকে এট্টা কথা বলব বউ, শোন্।' স্পর্শ নিলো না মণিলাল। তবে ঝুঁকে পড়লো কাঞ্চিবউর উপর—'যাবি বউ, তুই যাবি আমার সাথে। তোকে বে করব আমি। এমন ধারা যন্ত্রণা আর সইতে হবেনি তোকে।

'উঃ, আর সইছেনি গো।' ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে কাঞ্চিবউ। অনেক কষ্টে চিৎ হয়ে শোয়। সব জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেই ও যেন চোখ তুলে তাকাতে চাইলো। কথা বলতে কষ্ট হয়, টেনে টেনে বললো তবুও—'মিনসে আবার এক্ষুণি এসে পড়বে। একবার তো আমার সর্ব্বনাশ করেছো। আবার বেপদ বাড়াতি চাও? যাও।'

সর্ব্বনাশ? কাঞ্চিবউর সর্ব্বনাশ করেছে মণিলাল? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায় মণিলাল। সবই অদ্ভুত, রহস্য। কাঞ্চিবউও শেষে ওকে বললো এ'কথা। ওর সর্ব্বনাশ করেছে মণিলাল। না, না গোটা 'পিথিমীটাই' আজ মিছে হয়ে গেছে। অর্জ্জুন, দয়াল, ভৈরব, শিবে নয় শুধু, শেষে কাঞ্চিবউও—

মন্থর পায়ে অন্ধকার উঠোনে এসে দাঁড়ালো মণিলাল। হঠাৎ মনে হলো—ও যেন ঘেমে উঠেছে। কাঁধের গামছাটা খুলে ও একবার মুছে

দিলো মুখটা। আর ঠিক সেই সময়েই আচমকা কে যেন ঝাপিয়ে পড়লো ওর ঘাড়ে। ক্ষুধিত সিংহের মতো—'শালা, উল্লুক······অতো পেরিত ভালো লয় শালা। পায়চেত্ত করলে পঞ্চাইত ছাড়বে, আমি ছাড়বনি। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। শালা ডাকু—'

ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটলেও মুহূর্তেই সব কিছু বুঝে নেয় মণিলাল। অতর্কিত আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে মাটীতে আর সেই সুযোগেই ওর বুকের ওপর চাপতে চেষ্টা করে সদাশিব। পারে না। সমস্ত শরীরটাকে আপ্রাণ শক্তিতে একটা চাড়া দেয় মণিলাল। চেঁচিয়ে ওঠে—'শোন্, শোন্, কথা শোন্ শিবে। তোর টাকা নে এইছি।

'ও টাকায় আজ তোর পোড়ানোর জ্বালানী কিনবো শালা।' সদাশিবের বাঁ-হাত থেকে এক মোচড়ে নিজের ডানহাতটা ছাড়িয়ে নেয় মণিলাল। বাঁ-হাত পারে না। তারপরই সুরু হয় হাত নিয়ে কাড়াকাড়ি। কে আগে কার কবজি অবশ করতে পারে। মণিলালের বাঁ-হাত অকেজো হলেও ডানহাতে ও অনেকটা সুবিধে করে নেয়। সজোরে চেপে ধরে সদাশিবের মণিবন্ধ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সমস্ত দেহের শক্তি ঢেলে দিয়েছে সদাশিব। মণিলালও আচমকা একটা ঝামটা মারলো প্রাণপণ ক্ষমতায়। হেলে পড়লো সদাশিব। ছুটে গেলো দু'জনের হাত দু'জনের মুঠো থেকে। এ' সহজ সুযোগ চলে যেতে দিলো না মণিলাল। পাল্টা আক্রমণের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো কিন্তু তার আগেই ওকে জাপটে ধরলো সদাশিব। আবার লড়াই, মাটীর ওপর লুটোপুটি। কথা নেই কোন, শুধু দু'জনের ক্লান্ত শ্বাসের দ্রুতস্পন্দন। হাঁপাচ্ছে ওরা। সারাদিনের খেটে আসা শ্রান্ত-ক্লান্ত হালের বলদ যেমন করে হাঁপায়। মুখে ফেনা তোলে। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে সদাশিবের চিবুকে একটা ঘুসি মারলো মণিলাল। একটু

ছিটকে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াল সদাশিব। হাঁপাতে হাঁপাতে মণিলাল হুঁসিয়ার করে—'এখনও ভেবে দেখ শিবে, ভেবে দেখ।'

উত্তর দেয় না সদাশিব। উন্মত্ত বেগে ছুটে আসে। এলোপাথালী ঘুসি চালায়। নাকে, পেটে, বুকে, চিবুকে। মণিলালও পাল্টা জবাব দেয়। অবলা কাঞ্চিবউর মার খাওয়া পঙ্গু দেহটাকে একটু আগে দেখে এসেছে ও। ওর উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ যেন আরও বেশী চঞ্চল হয়ে ওঠে। না, না, সইবে না মণিলাল। প্রতিশোধ চায় ও। রক্ত চায়। কাঞ্চিবউর প্রতিটি অশ্রুবিন্দুর দাম নেবে ও, সদাশিবের দেহ চিরে রক্ত কেড়ে নিয়ে।

আবার লড়াই। ঘুসিতে ঘুসিতে দু'জনেই অস্থির করে তোলে দু'জনকে। অথচ ভাঙ্গে না কেউ। রক্ত ঝরে, শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায় দেহ-মন। তবু যেন কিসের নেশায় ওরা এ' ওকে আঘাত করে চলে। মানুষ নয় ওরা, বলিষ্ঠ দুই মোষ যেন।

কিন্তু সত্যি ভাঁটা পড়ে একসময়। দুজনেই হাঁপায়। স্তব্ধ হয়। দাওয়ার ওপর উঠে বসে সদাশিব। সমস্ত শরীরটা জ্বলছে ওর। বুকের আগুনে নয়, অসহ্য চড়-চাপড়ের জ্বালায়। আর বাঁ-হাতটা—ভর দিয়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলো—ভয়ানক যন্ত্রণা, বুঝি গুঁড়ো হয়ে গেছে হাড়গুলো।

আর মণিলাল। গামছা দিয়ে মুখ আর কপাল মুছতে মুছতে বাড়ীর পথ ধরলো। চোখের জল নয়, ঘামই নয় শুধু। কপালটা কেটে গেছে অনেকখানি। স্পষ্ট বুঝতে পারে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে রীতিমতো।

এরপরও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো সদাশিব। হাতটা অবশ হয়ে গেছে, মাথাটা টনটন করছে। হাত আর মাথাই নয় শুধু সমস্ত শরীরটাই জ্বলছে যেন রাগে, অপমানে। বাগে পেয়েও কিছু করতে

পারলো না মণিলালের। বেটা বজ্জাত! ঘরের বউ নিয়ে টান মারবে আর কেউ কিছু বলতেও পারবে না শালাকে। বাড়ীতে এসেও রং সোহাগ করবে। এমন করে মেরে যাবে। না, এ' অপমান সইবার নয়, সইবে না ও। বাঁশের খুঁটিতে গা এলিয়ে, পা' ছড়িয়ে বসে ভাবছিলো সদাশিব। হঠাৎ উঠে পড়লো। ছুটে গেল ঘরে। নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলো কাঞ্চিবউ। কান্না নেই, কোঁপানী আছে আর আছে একটানা যন্ত্রণাপীড়িত গোঙানি। দেখলো সদাশিব। মায়া-মমতা নয়, সমবেদনা নয়—বুকের আগুন যেন টগবগিয়ে উঠলো আরও। কাঞ্চি-বউর ছড়ানো চুলগুলো মুঠো করে ধরলো গিয়ে হঠাৎ। টেনে তুললো আচমকা টানে—'ওঠ্, ওঠ্ হারামজাদী। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন—'

চীৎকার করে উঠলো কাঞ্চিবউ। ট্রেনে চাপা পড়া মানুষের অন্তিম আর্তনাদ—'উঃ, মাগো। ওগো দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি—

'থাম মুখপুড়ী। থাম্।' বউকে বসিয়ে সদাশিব হাঁটু ভেঙে বসলো মুখোমুখী। বউয়ের চুল ওর হাতের মুঠোয় বাধা—'শোন্, আমার সাথে কাল তোকে থানা যেতে হবে।'

'থানা?' অবাক হয়ে ছলোছলো চোখ তুলে তাকায় কাঞ্চিবউ—'থানা কেন?'

'যা শিইখে দেব, তা বলবি ব'বাবুকে। বাঁচতে চাস্ তো বলবি। বুঝলি? বলবি, মনা তোকে জুলুম করে সিদিন সাঁঝের বেলায়—'

'ও মাগো। না, না, আমি পারব নি। পারব নি।'

সজোরে একটা চড় কষে সদাশিব। চুল ধরে টানে—'বল, বলবি কিনা। বল্।' ডুকরে কেঁদে চলে কাঞ্চিবউ—'না, না, আমি পারবনি, পারবনি, আমি—

'বল্, বল্ হারামজাদী, বল্ করবি কিনা।' কাঞ্চিবউর চুলগুলো শক্ত করে ধরে মাটির দিকে ওর মুখটাকে ঠেলে আনে সদাশিব। হাঁটুর সঙ্গে নাকটা মিশিয়ে ফেলতে চায় যেন। তারপর সদাশিব উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের চাপ দেয় বউটার পিঠের ওপর—'বলতেই হবে। বলতেই হবে তোকে।'

অদ্ভুত সহিষ্ণুতা। কেঁদেই চলে কাঞ্চিবউ। ডুকরে কাঁদে। তবু চুপ। অমন জোয়ান পুরুষটার পায়ের চাপে গরুর গলকম্বলের মতো নরম তুলতুলে শরীর পিষে যেতে চায় তবু কথা বলে না মেয়েটা। শুধু কাঁদে।

'থামালি, হারামজাদী, থামলি। অতো ঢং কেন, পরপুরুষের সাথে পেরিতের সময় মনে ছেল না। এখন আবার ঢং।' বউটার কোমরে একটা নির্মম লাথি মারে সদাশিব।

কাঞ্চিবউ লুটিয়ে পড়ে বাঁ-দিকে। উঠবার চেষ্টা করে না, পড়ে থাকে। মুখ গুঁজে কেঁদেই চলে শুধু। একটানা মারতে মারতে সদাশিব নিজেই হাঁফিয়ে ওঠে। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মণিলালের সঙ্গে লড়াইয়ে এমনি হাত-পা সারাশরীর অবসন্ন। আর পারে না। দেহ-মন ভেঙে পড়তে চায়। ওর এ' অসহায়তায়ই যেন ওর ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আরও। আর এ' কান্না। মেয়েটার একগুয়েমী। সেটা যেন আরও দুঃসহ মনে হয়। প্রাণে ভয় নেই নাকি ওর। এত যে মার খায়, তবু চুপ।

যাক্—মরুক মাগী, মরুক। মার খাওয়া পঙ্গু দেহটার ওপর আবার সজোরে একটা লাথি কষলো সদাশিব।

'আঃ।' বুকের পাঁজর ছেঁড়া হঠাৎ একটা আর্তনাদ করেই স্তব্ধ হয়ে যায় কাঞ্চিবউ। মৃত্যুর মতো নিঃস্পন্দ। মৌন-অচঞ্চল। সদাশিব

ভয় পায়। মরে গেলো নাকি মেয়েটা? এগিয়ে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো দেহটাকে। না, মরে নি। দাঁতে দাঁত লেগেছে শুধু। এ' জন্যে বৃথা সময়ের অপচয়। দাঁড়ালো না সদাশিব। দরজায় খিল তুলে বেরিয়ে পড়লো আবার। এ'বার যদি মণিলাল এসে নিয়েও যায় মেয়েটাকে—নিক্। কিন্তু যা সইবার নয় তা সইবে না সদাশিব। সাজা দেবে মণিলালকে। নিজে না পারে, পঞ্চায়েতের কথা যদি না ও মেনে নেয় তবে থানায় যাবে। পেয়াদার খোঁচা খেয়ে কোথায় যাবে বাছাধন! অন্ধকার পথে আবার পা বাড়ালো সদাশিব। যাবে অর্জ্জুন বাড়ুইর বাড়ী, সেখানে ডেকে আনবে সকলকে। পঞ্চানন, ভৈরব দয়ালদের। জানাবে সকলকে আজকের সন্ধ্যার কথা। আজও যখন বাড়ী ছিলো না সদাশিব সেই সুযোগে একা একা ওর ঘরে ঢুকেছিলো মণিলাল। তারপর সকলে জোট বেঁধে বুদ্ধি আঁটবে। যুক্তি করবে। থানায় যাবার আগে কথাগুলো সাজিয়ে নিতে হবে। শুধু নির্জ্জলা সত্যি কথায় নাকি বড়বাবুরা খুসী হন না। একটু রংয়ের প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে অর্জ্জুন খুড়োর মাথা খোলে বেশ।

শলা-পরামর্শ শেষ করে সদাশিব যখন ঘরে ফিরে এলো রাত তখন দুপুর। ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার কেটে কেটে ঘরে ফিরলো সদাশিব। দরজা বন্ধ আছে তেমনি। সদাশিব উঁকি দিলো ঘরের ভেতর। না, বাতিটা নিভে গেছে। কান পাতলো, সাড়াশব্দ নেই কোন। তবে মরেই গেল নাকি?

কিন্তু থাক্। দরজাটা বন্ধই রইলো আপাততঃ। ক্ষিধের তাগিদ নেই তেমন। খেয়ে এসেছে অর্জ্জুন খুড়োর ঘরে। সদাশিব হুঁকো সাজালো কড়াপাকের তামাকে। তারপর খিল তুললো ঘরের। বিছানায় বসে মৌজ করে খাওয়া যাবে খন। ঘরে ঢুকলো সদাশিব। আলো জ্বাললো দেশলাইয়ের কাঠির খোঁচায়।

এ্কি ?

চমকে তাকালো সদাশিব। হাতের আগুন খসে পড়লো হাত থেকে। কাঞ্চিবউ নেই ? বিছানাটা তেমনি রয়েছে। সবই আছে আগের মতো শুধু কাঞ্চিবউ নেই ঘরে। হুঁকোটা ব্যস্তহাতে ফেলে রেখে ঘরের আলো জ্বাললো সদাশিব। নেই, সত্যি নেই কাঞ্চিবউ। এ'কোণে ও'কোণে কোথাও নেই।

তবে কি ?

না, বেশীক্ষণ ভাবলো না সদাশিব। আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়লো। এ'বারে সড়কি নিয়ে। শালা মনার এত সাহস! আর নয়, এ'বারে প্রাণে মারতে হবে। আবার মোড়লদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালো সদাশিব। জড়ো করলো সকলকে। জানালো কাঞ্চিবউ নেই! পালিয়েছে।

কাঁচা ঘুমের আমেজ কাটিয়ে সবাই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার। সদাশিব চীৎকার করে পাড়া কাঁপালো—'তা তোমরা যাই বলো আমি আজ রাত্তিরেই মনার চেতা জ্বালবো মাকালীর শ্মশানে।'

অর্জ্জুন প্রস্তুতই ছিলো—তা'লে এ'খনে আর কেন। চ, চ, উদের ধরে নে আসি।' 'চ, চ।' এক পলকে উঠে দাঁড়ায় সকলে।

'ছিঃ, ছিঃ, কি অনাচ্ছেষ্টি। ভগমান নেই, শালা ধম্মো বলে গাঁয়ে আর রইল না কিছু।' কে যেন মন্তব্য করলো ভীড়ের মধ্য থেকে।

রাত দুপুরে ডাকাত পড়লো মণিলালের ঘরে। একসঙ্গে হাঁক ছাড়লো সবাই—'মনা, এই মনা। ঘরে থাকবি তো বেরো।'

ডাকবার প্রয়োজন ছিলো না। সোরগোল শুনেই জেগেছিলো মণিলাল। বেরিয়ে এলো লণ্ঠন হাতে। সঙ্গে ছোটভাই হারু।

'কি, বেপারটা কি? এতরাতে হাঁকাহাঁকি কেন?' এ'বারে মণিলালই প্রথম হুঙ্কার ছাড়ে। আর নয়, মাথা নুইয়ে চললে চলবে না আর—'রাত-বিরেতে গাঁয়ের লোককে ঘুমুতেও দেবে না তোমরা।'

বিক্ষুব্ধ জনতা হঠাৎ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়। একটা চাপা গুঞ্জন গুন-গুনিয়ে ওঠে এ'কোণ থেকে ও'কোণে। মণিলালকে ঘরে পাবে বলে আশা করেনি কেউ। ওকে ঘরে পেতে চায়ওনি ওরা। তাই মুষড়ে পড়ে সবাই। হতাশ হয়।

'কাঞ্চিবউ কোথা বল্।' সদাশিব তেড়ে আসে।

'কাঞ্চিবউ?' এ'বারে মণিলাল নিজেই বিস্মিত হয়—'কেন, তোর ঘরে।'

'শালা, ল্যাকামো রাখ্। কোথা রেখেছিস্ বল্।'

'মুখ সামলে কথা বলবি শিবে। আর লয়, অনেক সয়েছি। আর সইব নি।' মণিলালের উদ্ধত ভঙ্গি।

'রাখ্, রাখ্।' সদাশিব বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসে। এখন ওর সাহস বেশী। দলে ভারী, হাতে সড়কি। ভয় পায় না মণিলাল। ঝাপিয়ে পড়তে যায় কিন্তু হঠাৎ মধ্যস্থ দাঁড়ালো অর্জ্জুন মোড়ল—'হ্যাঁরে মণা, ঘরে যদি নাই রাখবি তবে আর ভয় কিসের শুনি। ছেড়ে দে না, দু'টো লোক গে দেখি আসুক ঘরটা।'

'তা যাবে যাও। ও শালা গেলে সইবনি কিন্তক।'

'আমি যাব। আমি আর পঞ্চা।'

'যাও।' মণিলাল পথ ছেড়ে দেয়—'ভালো করি দেখো কিন্তক। বালিসটাও দেখো। ওতেও তো লুকিয়ে রাখতে পারি।'

বালিস ছিঁড়ে অবশ্য দেখলো না ওরা। কিন্তু ছোট বেড়ার ঘরখানা তন্নতন্ন করে দেখে নিতে ভুললো না। বোন নয়নতারা কাঁদছিলো,

মণিলালের মা পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেছে ভয়ে। হাক চুপ। মণিলাল ফুঁসছে রাগে।

'নাঃ নেই।' ফিরে এলো অর্জ্জুন আর পঞ্চানন!

থেমে গেলো জনগুঞ্জন। তবে? তবে আর কোথায় যাবে কাঞ্চিবউ? প্রত্যুৎপন্ন পুরুষ অর্জ্জুন বাড়ুই। আদেশ করলো মংলা আর নীলাম্বরকে—'ইষ্টিশনে যা তোরা। যদি পাস্ বেঁধে নে আসবি।' তারপর ঘুরে দাঁড়ালো পান্নুর দিকে—'তুই যা তিলডাঙার দিকে। উদিকেই তো বাপের বাড়ী ওর। সেখেনেও যেতে পারে। আর চ' আমরা সবাই গাঁ-টা ঘুরি দেখি। চ', চ', তুইও চ' মনা।'

বলতে হতো না। এমনিতেই যেতো মণিলাল। কাঞ্চিবউর জন্যে যে একজনের বুক এখনও কাঁদে—সে মণিলাল। সবাই বেরিয়ে পড়লো। ওলাউঠায়, মায়ের দয়ায় একসঙ্গে সারা গ্রাম শ্মশান হয়ে গেলেও এমন করে বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে না গ্রাম। কিন্তু কাঞ্চিবউ, একটা সাধারণ গ্রামীন কৃষিবধূ, সমস্ত গ্রামের ওপর একটা চৈতালী ঘূর্ণী যেন। রাতগভীরে ঘরে ঘরে দল বেঁধে ঘুরলো মোড়লের দল। অনেকেই চলে গেলো পর পর। বাকী রইলো জনদশেক মানুষ। লণ্ঠনের আলো নিয়ে বনবাদারও খুঁজলো কেউ কেউ। অনেক চেষ্টা হলো, অনেক ঘোরাঘুরি হলো। কিন্তু ব্যর্থ অভিযান! গ্রামের ভেতর সত্যি নেই কাঞ্চিবউ, সত্যি নেই। পালিয়েছে। শেষরাতের দিকে সদাশিবের বাড়ী ফিরছিলো ওরা। শ্মশানফেরৎ মিছিল যেন একটা। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে চলছে যেন সবাই।

'ওটা কি, ওটা কি গো।' চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় গণপতি। আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো সদাশিবের বাড়ীর পাশের পুকুরটা।

'খাঁ।' এক রুদ্ধ চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো সকলের মুখ থেকে। থমকে দাঁড়ালো মানুষগুলো। সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মণিলাল। তুলে নিয়ে এলো ওটা। দেহ। জলে ভিজে ফুলে উঠলেও, মুখটা ভয়ানক রকমের বিকৃত হয়ে গেলেও সবাই চিনলো, সবাই বুঝলো এ কে? কার মুখ? এ'মুখ সকলের চেনা।

'দেখ, খুড়ো। শিবে দেখে লে—পালায়নি কাঞ্চিবউ, পালায়নি মরেছে।' মাটীর ওপর দেহটাকে শুইয়ে দিলো মণিলাল—'এ'বারে ফুর্ত্তি করো, হল্লা করো খুড়ো। কাঞ্চিবউ লেই, মরেছে।'

চলে যাচ্ছিলো মণিলাল। অর্জ্জুন পথ আগলে দাঁড়ালো—দাঁড়া মরাটাকে শিবের ঘরে লে চ'।

'শিবে লেবে।'

মণিলালের পিঠে হাত বুলোলো অর্জ্জুন, স্নেহস্পর্শ—'চ', চ' মনা চ'।'

বেশী আপত্তি করলো না মণিলাল। ও জানে, ও ছাড়া এদেহ কেউ ছোঁবে না। সকলের আগে দেহটাকে বয়ে নিয়ে চললো মণিলাল, পেছনে জনতা। তৎপর অর্জ্জুন এরই মধ্যে কাজ সেরে নিলো। লোক পাঠালো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে, গ্রামের চৌকিদার গোপেশ্বরকে পাঠানো হলো থানায়। কড়া হুকুম—'খুব জলদি যাবি গোপে, খুব জলদি।'

চৌকিদার ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে। ওরা এসে উঠলো সদাশিবের উঠোনে। গ্রাম্য বাতাস কথা বইতে জানে। সবাই যেন জানলো কেমন করে, ভোরের আগেই উঠান ভরে গেলো। সারাগ্রাম ভেঙে পড়লো এইখানে। সবাই দেখে কাঞ্চিবউকে আর দেখে মণিলালকে। সকলের চোখে মণিলাল আজ যেন অপার এক বিস্ময়। বহুবার চলে

যেতে চেয়েছে মণিলাল কিন্তু অর্জ্জুন, পঞ্চানন ধরে রেখেছে জোর করে। বলেছে—'এখনও অনেক কাজ বাকী মনা। চেত্যায় ওকে নে যেতে হবে না ?'

প্রেসিডেন্ট এলো, এলেন বলরাম দারোগা। সঙ্গে পেয়াদা, সেপাই। 'আসুন কত্তা, আসুন।' আদর আপ্যায়নের জন্তে ব্যস্ত হয়ে ওঠে অর্জ্জুন, পঞ্চানন ! ভাঙা দু'টো কাঠের জলচৌকি নিয়ে এলো সদাশিব। বসে বসে অর্জ্জুনের মুখ থেকে সমস্ত বিবরণই শুনলেন বলরাম দারোগা আর প্রেসিডেন্ট। একসঙ্গে যেন সবকটা আঙুল প্রসারিত হলো এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা মণিলালের দিকে—'ওই, ওই যে মনা।'

প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অতিকষ্টে চেপে রেখেছিলো মণিলাল। অর্জ্জুন মোড়লের মিথ্যে কথাগুলো শুনছিলো এতক্ষণ। ক্ষুধিত বাঘের চোখের আগুন ছিলো ওর চোখে। দু'একবার ঝাঁপিয়ে পড়তেও চেয়েছিলো কিন্তু মংলা আর হরিধন বাধা দিয়েছে। ধরে রেখেছে শক্ত করে। এবারে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এলো—'না, না হুজুর, মিছে কথা। ও খাঁটী কথা লয়। দোষী লয় কাঞ্চিবউ, আমার পাপ লেই—'বলতে বলতে বলরাম দারোগার পা জড়িয়ে ধরে মণিলাল। শক্ত চামড়ার বুটজুতো থেকে এক চাপলা মাটী লেপটে নেয় কপালে।'

'ছাড়, ছাড়, শালা শূয়োর।' একটা হঠাৎ টানে পা জোড়া ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন বলরাম দারোগা। কিন্তু পারেন না। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মণিলাল। ওর পিঠে এলোপাথাড়ী কতগুলো 'হাণ্টার' চালিয়ে যান বলরাম দারোগা—'ওঠ্, ওঠ্, উল্লুক্, শালা, শূয়োরের বাচ্চা। এতেই এত। বাঁশডলা, চাবুক তো পড়েই রইলো রে। চল্, চল্, থানায় চল্। সব হবে।'

যা কেবলই পা দু'টো ছেড়েছিলো মণিলাল। বড়বাবুর চোখের ইঙ্গিতে দু'টো পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো মণিলালের উপর। হাতে হাতকড়া বাঁধলো শক্ত করে। তারপর টেনে নিয়ে চললো সরকারী সড়কের দিকে। পুলিসের গাড়ী রয়েছে সেখানে। উপস্থিত জনতা তাকিয়ে আছে মণিলালের দিকে। সব চোখে ঘৃণা। জলে যাচ্ছে মণিলালের বুকপ্রাণ। অগ্নি পর্ব্বতের গহ্বরে যেন বিরাট একটা উদ্গীরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ফেটে পড়তে চাইছে, পারছে না।

মণিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে কাঞ্চিবউর লুটোনো দেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন বলরাম দারোগা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দৃষ্টি বুলোলেন মাথা থেকে পায়ে। অর্জুনের কথা মিথ্যে নয়, কাঞ্চিবউর সারাশরীরে যে মাতৃত্বের সূচনা তা এক পলকেই বুঝে নিলেন ছত্রিশ বছোরের অভিজ্ঞ অফিসার। হুকুম হাঁকলেন—এটাকেও থানায় নিয়ে যেতে। এ'সব বিশ্রী আর নোংরা কেসগুলো একার হাতে করার মতো নয়। অনেককে সাক্ষী রেখে ডায়েরী ক'রতে হবে। কাঞ্চিবউ আর মণিলালকে নিয়ে বিদায় নিলেন বলরাম দারোগা। সঙ্গে গেল অর্জুন, পঞ্চানন, ভৈরব আর সদাশিব। সন্ধ্যার আগেই মৃতদেহ ফিরিয়ে পাবে। এই প্রতিশ্রুতি।

তারপর!

এর পরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নয়, রাজ-আদালতেও প্রমাণিত হলো—মণিলাল দোষী। পাজী! সাত বছোরের সশ্রম কারাবাস।

এ' পর্য্যন্ত এসেই ডাক্তার সরকার একটু থেমেছিলেন। টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে, ঠোঁটে চেপে বলেছিলেন—'এরপরেও কি

আপনারা আমায় আরও এগোতে বলেন। এর পরের কাহিনী তো না বললেও বুঝে নেবার মতো। নিজেরা ভাবুন।'

ডাক্তার পা ঝাড়া দিতেই আমরা বাধা দিয়েছিলাম—'সেকি, আমাদের তো মনে হচ্ছে এরপরেই আসল গল্প। বলুন।'

বসতেই হলো শেষে। ডাক্তার সরকার তার উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ শেষ করেই উঠেছিলেন সেদিন।

সাত বছোর পরে আবার ফিরে এলো মণিলাল।

নিজের গ্রাম, নিজের ঘর—সেই পুরোণো পৃথিবী। ফসলের স্বর্ণ-ছটায় উজ্জ্বল প্রান্তরের দিকে তাকালে বুকে যে আনন্দের ঢল নেমে আসে—মণিলালের বুকে সেদিন তারও চেয়ে গভীর তৃপ্তি নেমে এলো যেন। আহা:, কতোদিন পরে, যেন কত যুগ পরে পৃথিবীর মাটিতে ওর নির্ভয় পদক্ষেপ। একটানা সাত বছোরের অমানিশার ফাঁকে বাইরের আকাশে কতো পূর্ণিমা চাঁদ এসে এসে ফিরে গেছে তার পাক্ষিক নিয়মে, কতো নবান্নের স্বাদ পেয়েছে এ' পৃথিবী।

মণিলাল নতুন স্বপ্ন নিয়ে ফিরে এলো ঘরে। নতুন করে আবার রাঙাবে জীবন—এ' আশায়। ছোট ভাই হারু আজ আর সেই তের বছোরের হারু নয়, পুরো দস্তুর কৃষাণ। মণিলাল স্বপ্ন আঁকে চোখে—নরম মাটির বুকে চাষ করবে ও, বীজ ছড়াবে হারু, ফসল কেটে আঁটি আঁটি ধান ঘরে আনবে হারু, মাড়াই করে গোলায় তুলবে মণিলাল।

মণিলাল প্রথম আঘাত পেলো বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই। সন্ধ্যার অন্ধকার কালো হয়ে আসার আগেই বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো মণিলাল। হারাধন ব্যস্ত ছিলো গোয়ালঘরে, ছুটে বেরিয়ে এলো। চোখ

যরতে এসে দাদাকে বুকে জড়ালো। মণিলালও বুকে চাপলো ভাইকে। পঞ্চবটীর সেই মধুমুহূর্ত্তক্ষণের শেষ হলো যখন—মণিলাল শুনলো মা নেই। মারা গেছেন আজ প্রায় চার বছোর আগে, নয়নতারার বিয়ে হয়ে গেছে, দু' বছোর হলো।

তবু মণিলাল ভেঙ্গে পড়েনি ততটা। বুড়ী মার শোকে চোখে জল গড়ালেও শুকোতে সময় নিলো না, নয়নের বিয়ে হয়েছে—হোক্, সুখী হোক্। মণিলাল উঠে এলো ঘরের দাওয়ায়। হারুর ঘরে হারু একা নয় আজ, আরও একজন। ডাগোর ডোগোর, অনেকটা যেন সেই লক্ষীন্দর মণ্ডলের ছোট মেয়েটার মতো। এত পরিবর্ত্তন, হঠাৎ ঘটে যাওয়া এতগুলো ঘটনা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলো মণিলাল।

সংসার বুঝে নিলো, কর্ত্তব্য বুঝে নিলো হারাধনের কাছে।

অর্জ্জুন মণ্ডল আজ আর নেই। কিন্তু পঞ্চানন আছে, সদাশিব আছে। ওরা দুর থেকে হাসে. দেখা হলে কথা বলে না—বিদ্রূপ করে, ইতর রসিকতা করে। মণিলাল যা ভুলতে চায় ওরা তা ভুলতে দেয় না। গ্রামে ফিরে দু'দিনেই বুঝতে পারে মণিলাল। সেই সেদিনের—সাত বছোর আগের সেই পাপ না করা ভুলের মাশুল, আজ নয় শুধু হয়তো বা চিরজীবনই বয়ে চলতে হবে। চিরদিনই ওকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে মানুষ। হাসবে, উপহাস করবে। একঘরে নয়, হাটে-বাজারে পয়সা দিলে জিনিস ও পায়, চুল-দাঁড়ি কামাতেও অস্বীকার করে না বাজারের নাপিতগুলো। তবু, তবু যেন অসহ্য মনে হয় এ' জীবন। দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে মণিলাল।

এ' অস্বস্তিতেই দিন গোণে ও। দিন পনের কাটে। ও জানে, যে যাই বলুক হারাধন ওকে দাদা বলেই ডাকবে চিরকাল। এ' নরকেই ও থাকবে তবু। গাঁয়ের লোককে চিনতে তো বাকী নেই আর।

ওদের ভয়ে ভিটে ছাড়বে মণিলাল? না, কখনও না। কমলপুরের মাটী, সে যে ওর চিরজীবনের শয্যা। মৃত্যুর পর সমাধি।

গ্রামের আর সব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করলো মণিলাল। একা একা পথ চলে, পুকুর পাড়ে মাছ ধরে। ক্ষেতের কাজ না থাকলে সারা দুপুর গরু চরায় মাঠে। সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে একটু অবাকই হলো মণিলাল। হারাধন ফেরেনি তখনও। কিন্তু এমনটিতো হয়নি কোনদিন। মণিলাল ফেরার আগেই হারাধন ঘরে ফেরে। দু' ভাই দাওয়ায় বসে সংসারের কথা বলে, ক্ষেতখামারের খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু হারাধন ফেরেনি এখনও। মণিলাল গোয়ালঘরের ভেতরটা একবার ঘুরে এসে দাওয়ায় এসে বসল। হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক ভরল কল্কেয়। তারপর এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু পোড়াকাঠের আগুনের জন্যে। ভাতের হাঁড়ি চড়িয়েছিল হারাধনের বউ। মণিলাল ভেতরে এসে দাঁড়ালো। আধহাত টানা ঘোমটা মুহূর্তেই একহাত হয়ে গেল।

'একটু আগুন দাও দিনি।' বড় শান্ত মণিলালের গলা।

আগুন দিল হারাধনের বউ। মণিলাল কল্কেয় তুলে নিল, ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে এল। দরজার মুখেই হারাধনের সঙ্গে দেখা—'দাদা, তুমি এখেনে।'

'আগুনের জন্যি।' মণিলাল একটু হাসল--'এক ছেলিম তামাকের জন্যি মেহনৎ কি কম?' হাসতে হাসতে ভাইকে পাশ কাটিয়ে গেল মণিলাল।

হঠাৎ!

দাওয়ায় উঠতেই চমকে উঠলো মণিলাল। পা জোড়া থেমে গেল। আর্তনাদ কেন? কে? হারাধনের বউ? ছুটে এলো মণিলাল। সত্যি, হারাধনের বউ কাঁদছে। হারাধন মারছে। কিন্তু কেন? কান পাতলো

মণিলাল। বেড়ার ফুটোয় উঁকি দিলো। বউয়ের চুল ধরে ঝিনুঝিয়ে বলছে হারাধন—'বলিনি তোকে, হারামজাদী কদিন বলেছি—আমি না থাকলে ঘরে কপাট দিবি তুই।'

'হারা-ধ-ন।' ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতোই যেন অকস্মাত গর্জে উঠলো মণিলাল। তারপরই ক্ষণিকের স্তব্ধতা। ভেতরে, বাইরে। চোখের পলকে ছুটে গেল মণিলাল। উন্মাদের মতো। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বাঁশের দরজা। কিন্তু মুখোমুখী দাঁড়াতেই যেন সব উত্তেজনা নিভে গেল। হারাধন দাঁড়িয়ে আছে আর ওর পা জড়িয়ে পড়ে রয়েছে মেয়েটা।

না, সত্যি সেদিন কিছুই বলতে পারেনি মণিলাল। হারাধন তো আর সদাশিব নয়। সদাশিবের বুকে ছুরি বসাতেও দুঃখ নেই কিন্তু ও যে ভাই। রাম লক্ষণের সম্বন্ধ। শেষে, শেষে হারুও—মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মণিলাল।

তবে পরদিন ভোরে মণিলালকে অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি কমলপুরের কোথাও।

এখানেই ডাক্তার সরকারের কাহিনীর ইতি।

আমরা কৌতূহলী হয়ে শেষ প্রশ্ন করেছিলাম—'কিন্তু ডাঃ সরকার, ভজুয়াকে মারতে গিয়েছিল কেন লোকটা। আর এ' গল্পের সঙ্গে সেকাহিনীর সম্বন্ধটাই বা কি?'

হেসে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সুব্রত সরকার। ষ্টেথিস্কোপটা গলায় জড়িয়ে নিলেন—'সে আমি কি করে বলব বলুন। আমরা সামান্য ডাক্তারমানুষ, মনস্তাত্ত্বিক তো নই। ছুরি-কাঁচি চালিয়ে রক্তমাংসের হিসেব দিতে পারি কিন্তু মানুষের মন—সে তো আমাদের নয়।'